পুণ্যরজঃ ছুঁয়ে

ভ্রমণকথা

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥মুখবন্ধ॥

পুণ্যভূমি ভারত আর তার পথে প্রান্তরে, নদী বন পাহাড় ও গিরিকন্দরে ছড়িয়ে আছে কতো তীর্থ, কত মহাত্ম্য। তার কয়েকটি মাত্র পুণ্যরজঃ আমার সৌভাগ্য হয়েছে শিরে ধারণ করবার কারণ তীর্থের দেবতা সেই জায়গাগুলোয় আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। আমার ব্যক্তিগত প্রত্যয় যে তীর্থের দেবতা না টানলে তীর্থ দর্শন হয় না। সেই তীর্থ দেবতার ডাকে যে কয়েকটি পুণ্যরজঃ মস্তকে ধারণ করেছি এ তারই একটি সংকলন। এইখানে দেওয়া ছবি বেশিরভাগ ব্যক্তিগত সংগ্রহের, কিছু আন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত। পাঠকের ভালো লাগলে এবং পড়তে পড়তে যদি তাদের মানস ভ্রমণ হয় তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের সাফল্য। গুরুকৃপায় এই সংকলন প্রকাশিত হল।

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

BANGLADARSHAN.COM

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রী সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

গুরু বন্ধন

******

গুরু সর্ব মোক্ষ দাতা, গুরু পরাৎপর
গুরু অজ্ঞান নাশন, গুরু সারাৎসার।
গুরুর মধ্যে বিশ্ব রাজে, বিশ্ব মাঝে গুরু,
গুরু ব্যাপ্ত চরাচরে, পরম পরশ গুরু।
গুরুর মধ্যে মাতা স্থিত, মাতার মাঝে গুরু,
অমূল্য রতন গুরু, সচ্চিদানন্দ গুরু।
গুরু পরশমণির ছোঁয়ায় অবোধের বোধ গুরু,
বন্দে সর্ব জগৎগুরু, বন্দে সদ্গুরু।

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
অমরনাথ যাত্রা	৫
জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ দর্শন	১৭
বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনারায়ণ দর্শন	৩৮
দেবদেউলের দেউলটি	৫৩
জয়দেবের মেলা	৬৬
ওঁম মণিপদ্মে হুম	৭২
পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপধাম	৯৪
তারাক্ষেত্রে তারাপীঠে	১১০
ঈশ্বরের নিজদেশে	১২৮

BANGLADARSHAN.COM

॥অমরনাথ যাত্রা॥

শিব স্তোত্র:

কর্পূরগৌরম করুণাবতারম
সংসারসারম ভুজগেন্দ্রহারম
সদা বসন্তম হৃদয়ারবিন্দে
ভবমভবামি সহিতম নমামী।

তুষারতীর্থ অমরনাথের উল্লেখ আছে কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে যাকে কাশ্মীরের ইতিহাসের অন্যতম উৎস মানা হয়। অমরনাথ বিখ্যাত তার প্রাকৃতিক বরফের শিব লিঙ্গের জন্য যা গোটা শ্রাবণ মাস থাকে। এই শিবলিঙ্গ প্রথম আবিষ্কার করেন বুটা মালিক বলে এক মেষ পালক। কথিত আছে বুটা মালিক ওই জায়গায় এক সাধুর দর্শন পান যিনি তাকে এক থলে ভর্তি কয়লা দেন, বুটা মালিক বাড়ি এসে দেখেন যে সেই কয়লা সবটাই সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে। দেখে অভিভূত বুটা সেই সাধুকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখেন সেখানে ওই বরফের শিবলিঙ্গ। বুটা মালিকের বংশধররাই আজও এখানে বাবা অমরনাথের সেবায়েত। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী এখানে বসে মহাদেব পার্বতীকে অমরত্ব লাভের গুপ্তকথা শুনিয়েছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর চক্র থেকে বের হবার এই কথা গুপ্ত স্থানে বলবেন বলে শিব পাহেলগাঁও তে তাঁর ত্রিশূল, চন্দনবাড়িতে মস্তকের চন্দ্র, শেষনাগে গলার সর্প, পঞ্চতরণীতে পঞ্চ ভূত যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ তত্ত্ব আর মহাগুনাস পর্বতে পুত্র গণেশকে রেখে অমরনাথের গুহায় গেছিলেন। কিন্তু এই গুপ্ত কথা অদ্ভুত ভাবে শুনে ফেলেছিল দুটি কবুতর। শিব পার্বতীকে বলেছিলেন যে উনি এই কথার মাঝে মাঝে পার্বতীকে জিজ্ঞেস করবেন তিনি বুঝেছেন কিনা, পার্বতী যেন তখন 'হুঁ হুঁ' বলে সাড়া দেন। কথা শুনতে শুনতে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েন আর ওই কবুতর জোড়া হুঁ হুঁ করে সাড়া দিয়ে যায়। শিব কথা শেষ করে পার্বতীকে নিদ্রিত দেখে ভাবেন যে কে তাহলে সাড়া দিল এবং দেখেন ওই জোড়া কবুতর। দেখে ত্রিশূল নিয়ে মারতে উদ্ধত হলে তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় এক মুনির স্ত্রীর আঁচলের আড়ালে। তখন সেই মুনি শিবকে নিরস্ত করে বলেন যে অমর কথা শ্রবণ করে ওরা তো অমর হয়ে গেছে। সেই জোড়া কবুতর আজও ওখানে বিদ্যমান।

শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।

তীর্থের দেবতা না টানলে তীর্থ দর্শন হয় না। এই কথার যথার্থ উপলব্ধি এখানে বলবো। বেশ কিছু বছর আগের কথা। আমাদের পরিবারের অমরনাথ যাত্রা। সপরিবারে বলতে আমি, বাবা, মা, দু বছরের বোন, ঠাকুমা, ছোটকাকা আর ছোট পিসির শাশুড়ি প্রতিভা দেবী। যেহেতু দুজন বৃদ্ধ মানুষ আছেন, তাই এম্বেসী ট্রাভেলস এর সঙ্গে যাত্রা। কাশ্মীরের শ্রীনগর পৌঁছে ওঠা হলো এম্বেসী হোটেলে। শ্রীনগর জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী, আর

BANGLADARSHAN.COM

কাশ্মীর তো বিখ্যাত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য, তাই তো তার আরেক নাম ভূস্বর্গ। জম্মু থেকে শ্রীনগর বাসে বারো ঘণ্টার রাস্তা, পথে পড়ে বানিহাল টানেল যেটি সাড়ে আট কিলোমিটার লম্বা একটি ডাবল টিউব টানেল পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার ওপর যা বানিহাল আর কাজিগুণ্ডকে সংযোগ করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিরিখে সত্যিই শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকা অপরূপা, ঝিলাম নদীর পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শ্রীনগর শহর, আর ডাল লেক, চার মিনার, চশমাশাহী, ঝিলামের বুকে আর ডাল লেকের জলে শিকারা আর হাউস বোট বাড়িয়েছে তার শোভা, কাশ্মীরি নারী পুরুষ উভয়েরই সৌন্দর্য স্বর্গীয়, সব মিলিয়ে পাহাড়ের কোলে শ্রীনগর যেন একটি তুলি দিয়ে আঁকা ছবি।

এর আগেও আমরা কাশ্মীর এসেছি, এটা আমাদের দ্বিতীয় বার আসা, সেবারে গুলমার্গের গল্ফ ক্লাবে আমরা বিগ বি অমিতাভ বচ্চন ও রেখা অভিনিত মিস্টার নটবরলালের শুটিং দেখি, অমিতাভ বচ্চন, রেখা আর আমজাদ খানকে সামনে থেকে চাক্ষুস দেখি আর মা অমিতাভজির অটোগ্রাফও সংগ্রহ করেন ওঁর কাছে গিয়ে।

ওখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো সোনমার্গ, গুলমার্গ, মুঘল গার্ডেন, টিউলিপ গার্ডেন, হজরত বল মসজিদ, রওজা বল যেখানে যীশু খ্রীষ্টের সমাধি, ক্ষীর ভবানী যেখানে শঙ্করাচার্য ও স্বামীজী এসেছিলেন, শঙ্করাচার্য মন্দির এসব দেখে নেওয়া হল প্রথম তিনদিনে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর জীবনের এগারো বছর বয়সে রেশম পথে ভারতে চলে আসেন কারণ তৎকালীন ইহুদি সমাজের রীতি ছিল এগারো বছর বয়েস হলেই ছেলেদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো, বারো থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত ভারতে থেকে দশনামীর নাথ সম্প্রদায়ের যোগী হিসেবে সাধনা করেন, নাম হয় ঈশানাথ, ঘোরেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যার একটি শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধাম, কাশী এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের কিছু নীতি নিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম হিসেবে প্রচার করেন, যার মূল দুটি নীতি ছিল অহিংসা ও মানবসেবা। যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুস বিদ্ধ করার পরেরদিন নামিয়ে তিনদিন ধরে তাঁর দেহ রাখা ছিল একটি গুহায়, তার পরের চতুর্থদিনে আর তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি, তাঁকে কেউ দেখেওনি। যীশু তাঁর মাকে নিয়ে চলে আসেন ভারতে এবং তিরাশি বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, সেই প্রমাণ সংরক্ষিত আছে লাদাখের হেমিস গুমফায়, তাঁর পর তিনি দেহ রাখলে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয় রওজা বলে। এইসব দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে গিয়ে খুব ভাব হয়ে গেল স্টেট ব্যাংকে কর্মরত পাঁচ জনের একটা দলের সাথে, সবাই সহকর্মী, দুজন মহিলা, তাঁরা মাসি আর বোনঝি, মণিমা আর স্বাতী আর তিনজন বরুণকাকু, কেষ্টকাকু আর অজয়কাকু। ওঁদের সঙ্গে গান গল্পে খুব মেতে উঠলাম আর যেহেতু ওঁরা একই হোটেলে আছেন আর ওঁরাও অমরনাথ যাবেন তাই সহযাত্রী হিসেবেও ওঁরা আমাদের সঙ্গে সাদরে মেলামেশা করতে লাগলেন। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে দর্শনের জন্য পূর্ণিমার চারদিন আগে পৌঁছলাম পাহেলগাঁও।

ওখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে। পাহেলগাঁও থেকে অমরনাথ ২৪ কিমি। হঠাৎ ওখানকার একজন অফিসার যিনি সরকারি ভাবে যাত্রার পারমিশন দেবেন, তিনি আমার বাবাকে বললেন যে এতো ছোট বাচ্চা অর্থাৎ আমার দুবছরের বোন, তাকে নিয়ে উনি যাবার অনুমতি দেবেন না, কারণ ওই যাত্রার দুটো খুবই হাই অল্টিটুড পয়েন্টস, পিসু টপ আর মহাগুনাস টপ, ওই জায়গাগুলোতে সুস্থ লোকেদেরই অক্সিজেন ক্রাইসিস হয়, আর

BANGLADARSHAN.COM

আমার বোনের, যে মাত্র দুবছরের, সেখানে প্রাণ সংশয় হতে পারে, তাই আমার মা বাবা অত ছোট বাচ্চা নিয়ে যেতে পারবেন না। মা তো কেঁদেই ফেললেন। বাবারও মন খারাপ, আমিও কাঁদছি। এমন সময় আমাদের গ্রুপের যিনি ম্যানেজার ছিলেন তিনি বললেন যেহেতু ছোট কাকা আছেন সঙ্গে, তাই ঠাকুমা আর প্রতিভা দেবীকে নিয়ে ছোটকাকা ঘুরে আসুন। ওঁরা শুনে এগিয়ে গেলেন। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছি। এমন সময় মণিমা আর অজয়কাকু এগিয়ে এসে আমার মা বাবাকে বললেন যে যদি আমার মা বাবা রাজি থাকেন, ওঁরা ওদের দলের মধ্যে আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে আনতে পারেন কারণ অজয়কাকুর নাকি আমার মত একটা মেয়ে আছে, তাই নিজের মেয়ের মতো দায়িত্ব নিয়ে উনি আমাকে নিয়ে যাবেন। আমার মা বাবা রাজি হলেন আমার অনেক অনুরোধে। কিন্তু আমার কাকা আর ঠাকুমা পরিষ্কার বলে দিলেন যে ওঁরা আমার কোনো দায়িত্ব নেবেন না, আমি যেন ওদের থেকে আলাদাই থাকি। কারণ ওঁদের অজয়কাকুদের একদম পছন্দ নয়। আমাদের যিনি ম্যানেজার তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে আমি গেলে উনি আমার দায়িত্ব নেবেন।

চল' যাত্রী, চল' দিনরাত্রি–
কর' অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।

শুরু হল যাত্রা। "হর হর মহাদেব" "জয় অমরনাথ জী কি জয়" বলে পাহেলগাঁও থেকে চলা শুরু হলো, পিঠে রুকসাক, হাতে লাঠি, গায়ে গরম জামা, পায়ে স্নীকার্স পরে প্রথম চটি চন্দনবাড়ি। আমাদের দলের চলার ক্রম ছিল, প্রথমে বরুণকাকু, তারপর মণিমা, তারপর আমি, আমার পেছনে স্বাতী, ওর পরে কেষ্টকাকু আর সবার শেষে অজয়কাকু। পাহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি ষোলো কিলোমিটার রাস্তা পাহাড়ি রাস্তা হলেও রাস্তা ভালো, রাস্তার সঙ্গী সুন্দরী লিডার নদী আর যে রাস্তা ধরে এগোনো সেটা যেন শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা পেইন্টিং। সকাল দশটাতে শুরু করে চন্দনবাড়ি পৌঁছনো গেল বিকেল পাঁচটায়। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গরম লেগেছে তাই সোয়েটার, জ্যাকেট, টুপি সব খুলে হাতে। ওখানে যে বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা, সেখানে গিয়ে দেখা গেল সবায়ের জন্য একটা করে ক্যাম্প খাটে দুটো দুটো চারটে করে কম্বল দিয়ে বিছানা হয়েছে, পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে আটটার মধ্যে সবাই শুয়ে পড়লো কারণ পরেরদিন পাঁচটায় উঠে ছটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। পরেরদিন আমাদের পিসুটপ (১১৭০০ ফু) পেরিয়ে শেষনাগ (approx 14 km) পৌঁছতে হবে.....।

পরেরদিন ভোর পাঁচটায় উঠে ছটার সময় যাত্রা শুরু হলো। ওখান থেকে বেরোনোর আগে আমাদের প্রাতঃরাশ খেতে হলো, কারণ খালি পেটে রাস্তায় হাঁটা বিপদজনক। বিশেষতঃ সেদিন আমাদের পেরোতে হবে পিসু টপ। হেঁটে চলেছি, আস্তে আস্তে উঠতে আরম্ভ করেছি পিসু টপ চড়তে। বেশ কিছুটা ওঠার পরে দেখলাম অনেকেই পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছেন। কারণ আমরা উঠে এসেছি ১১৭০০ ফুট, এখানে একটু নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। কিন্তু চারিদিকের রূপসী প্রকৃতি সব ক্লান্তি হরণ করে নেয়। কথিত আছে শিবের প্রথম দর্শন লাভের জন্য দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হলে দেবতারা এতো অসুর বধ করেন শিবের কৃপায় যে সেখানে লাশের পাহাড় হয়ে যায় যা পরে পরিচিত হয় পিসু চড়াই হিসেবে। এবার ধীরে ধীরে লাঠি ধরে ধরে নামতে নামতে হঠাৎ নজর পড়ল পান্না সবুজ রঙের একটা হ্রদ যার তিনদিক বরফঢাকা পাহাড়ে ঘেরা। শুনলাম ওটাই শেষনাগ হ্রদ।

BANGLADARSHAN.COM

বেশ কিছুটা নেমে এলে একটা উপত্যকা। সেখানে আমাদের তাঁবুতে থাকতে হবে। অনেকগুলো তাঁবু রয়েছে, তার একটায় রান্না হচ্ছে। নেমে ওখানে পৌঁছলাম বেলা চারটে। ম্যানেজার কাকু আমাদের তাঁবু দেখিয়ে দিয়ে খাবারের কথা বলতে গেলেন। পিঠের বোঝা, হাতের লাঠি রেখে হাত মুখ ধুয়ে তাঁবুতে যখন গেলাম তখনই খেতে দিল। খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করে বাইরে বেরিয়ে দেখি সবে সন্ধ্যে হচ্ছে, আকাশের গায়ে আবির ছড়িয়ে দিনমণি পাটে বসেছেন। সেই শেষনাগ হ্রদে একটি সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকেই আপ্লুত, আমি তখনো এতটা পরিণত নই যে কিছু ভাববো, কিন্তু প্রণাম জানালাম নাগরাজকে। আরেকটু পরে চাঁদ উঠলো, জ্যোৎস্নাতে গোটা উপত্যকা যেন এক অপার্থিব সৌন্দর্য ধারণ করল। এর পরেই আমাদের রাত্রে খাবার দিয়ে বলে দেওয়া হলো পরেরদিন সাতটায় বেরোনো।

সারারাত প্রচন্ড ঠান্ডায় কেউই প্রায় ঘুমোতে পারেনি, সমস্ত গরমজামা পরে কম্বলের তলায় থেকেও শীত যেন কমছে না, তাই অন্ধকার থাকতেই সবাই উঠে তৈরী হয়ে নিলাম। একটু কিছু মুখে দিয়ে শুরু হলো চলা। আজ আমাদের উঠতে হবে মহাগুনাস টপ (১৪৫০০ ফুট), তারপর স্থিত হব পঞ্চতরণী তে (১২০০০ ফুট)। পঞ্চতরণী সেই জায়গা যেখানে শিব পঞ্চভূতকে ত্যাগ করে গেছিলেন। মহাগুনাস টপে গণেশজিকে রেখেছিলেন মহাদেব। মহাগুনাস টপে উঠেই মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অক্সিজেন ট্যাবলেট দিয়ে একটা জায়গায় হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল, কিছুক্ষণ পর ধাতস্ত হয়ে দেখি রাস্তা কিরকম সোজা নেমে গেছে, দুপাশে খাদের মধ্যে দিয়ে। দেখি অনেক নিচে একটা হেয়ারপিন বেন্ডের কাছে বরুণ কাকু দাঁড়িয়ে আছেন, দেখেই দৌড়োতে শুরু করলাম আমি, আর ফলে আরেকটু হলেই ইতিহাস হয়ে যাচ্ছিলাম। খুব সময়মতো বরুন কাকু ধরে না ফেললে একদম খাদে পড়তাম সোজা। আসলে ছুটে নামছিলাম আর পুরোটাই ঢালু, তাই টাল সামলাতে পারিনি, কিন্তু বরুণ কাকু লাফিয়ে এসে আমায় ধরে ফেললেন তাই অঘটনটা ঘটলো না। সবাই খুব বকুনি দিল। দেওয়ার কথাও। তারপর আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম, বেলা দুটোতে পৌঁছলাম পঞ্চ তরণী। পঞ্চ তরণী পাঁচটি নদীর সঙ্গম স্থল যে নদীগুলো পাশের ভৈরব পর্বতের বরফ থেকে নেমেছে, যাদের শিবের জটা মনে করা হয়।

BANGLADARSHAN.COM

এখানেও সেই তাঁবুতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। পৌঁছে একটু ফ্রেশ হয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম নদীগুলোর সামনে, খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, কিন্তু গ্লেসিয়ার থেকে নদীগুলোর নেমে আসা দেখতে দেখতে আর নানা রঙের আর আকারের নুড়ি পাথর কুড়োতে কুড়োতে আস্তে আস্তে সন্ধ্যে নামলো। চাঁদের আলোয় মনে হলো যেন রূপো গলিয়ে কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে। তার ওপর চাঁদের আলো একটা পাহাড়ের বরফে প্রতিফলিত হয়ে আরেকটা পাহাড়ের বরফে পড়ে যেন এক স্বর্গীয় নিসর্গ তৈরী করেছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে সেই নিস্তব্ধ অপার্থিব দৃশ্য উপভোগ করে প্রায় রাত বারোটায় শুলাম। পরেরদিন আমাদের অমরনাথ গুহায় যাত্রা যথারীতি ভোর বেলা। পরের দিন উঠে আর কোনো খাওয়ার পাট নেই, সেদিন যে পুজো দেব। ফ্রেশ হয়ে মাথায় মুখে জল দিয়ে কাচা জামাকাপড় পরে চললাম আমরা। সেদিন শ্রাবণী পূর্ণিমা, রাস্তায় দূরত্ব মাত্র ছ কিলোমিটার। আমাদের

আগে পিছনে বহু লোক চলেছে ঘোড়ায়, ডান্ডিতে, চলেছে সাধু, ব্যবসায়ী, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, সকলেরই কামনা পুণ্য লাভ। আমরাও চলেছি।

হঠাৎ আমাদের একটু আগে ঘোড়াতে যাচ্ছিলেন একজন, তার ঘোড়া পাহাড়ের খাদের পাথর সরে গিয়ে ঘোড়া সমেত ভদ্রলোক পড়ে গেলেন, একদম এক মুহূর্তের ঘটনা, আমরা দেখলাম দুটো পাথরের টুকরোর মতো ঘোড়া আর ভদ্রলোক নিমেষে খাদে হারিয়ে গেল। আমরা পুরো স্তম্ভিত, হতবাক। পাশের অতলস্পর্শী খাদের দিকে চেয়ে খুব ভয় করল হঠাৎ, কিছুদূর গিয়ে দেখি একটা রাস্তা খাড়া নেমে গেছে খাদের দিকে আর খাদের ওখানে কেউ লাল নীল জামা মেলেছে। আমি সেটা বলতেই একজন বলল যে ওটাই বলতালের রাস্তা আর ওগুলো নিচে দেখা যাচ্ছে তা তাঁবু। আবার চলা, এবারে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি রাস্তা বরফের ওপর দিয়ে আর মাঝখানে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, এটা অমর গঙ্গা নদী আর ওই বরফ যেটার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে সেটা অমরগঙ্গা গ্লেসিয়ার। আর তারপর একটু উঁচুতে সিঁড়ি উঠে গেছে যেখানে বরফলিঙ্গ দৃশ্যমান। অমর গঙ্গার জল মাথায় নিয়ে গ্লেসিয়ার পেরিয়ে পুজো আর দর্শনের লাইনে দাঁড়ালাম। কিছুটা এগিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় দেখি দুটো অদ্ভুত দেখতে পাখি গুহার ভেতরে উড়ে বেড়াচ্ছে। সাধুরা প্রণাম করে বললেন যে এরাই সেই অমর কথা শুনে অমর হয়ে যাওয়া কবুতরদ্বয়।

পুজো দিয়ে ওই জায়গায় একটু ছিলাম, মনখারাপ করছিল মা বাবার জন্য। মূলতঃ মায়ের উদ্যোগেই আমাদের আসা আর সেই মায়েরই দর্শন হলো না, এটা ভেবে কেঁদে ফেললাম। তারপর আস্তে আস্তে আবার এলাম ফিরে পঞ্চ তরণীর তাঁবুতে। সেদিন রাতটা ওখানে থেকে পরেরদিন আমরা চলে এলাম চনন্দবাড়ি। চন্দনবাড়ি থেকে পাহেলগাঁও আসার পথে পাঞ্জাবিদের ভান্ডারা তে লুচি, হালুয়া খেলাম, সঙ্গে চা। পাহেলগাঁও তে এসে দেখি তখনি একটা বাস ছাড়ছে আমাদের এম্বেসী ট্রাভেলস এর। দৌড়ে উঠে পড়লাম, সবে বসেছি আমাদের ম্যানেজার কাকু এসে বললেন যে আমার মা বাবা বলতাল দিয়ে গিয়ে অমরনাথ দর্শন করে আগেই ফিরে এসেছেন হোটেলে, বলতালের রাস্তা আসলে মিলিটারি রুট, খুবই রিস্ক ওই রাস্তা যেটা সোনমার্গ থেকে যাওয়া যায়, কিন্তু একদিনে দর্শন করে ফিরে আসা যায়।

আজ এতো বছর পরে মনে হয় মহাদেব না টানলে এইভাবে কি যাওয়া সম্ভব ছিল? ঈশ্বর ঠিক করেছিলেন আমায় দর্শন করাবেন, তাই তো টেনে নিয়ে গেছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

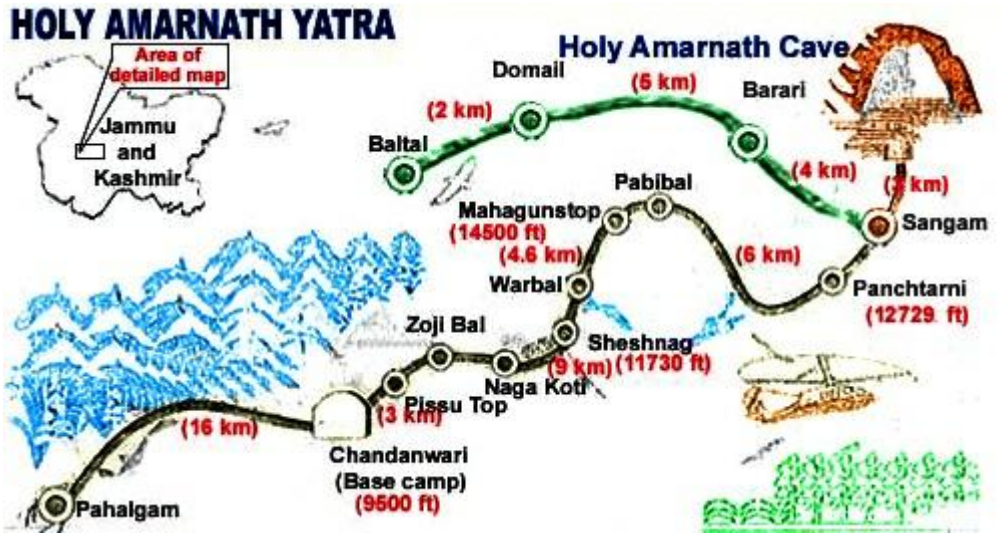

অমরনাথ

BANGLADARSHAN.COM

তুষারলিঙ্গ অমরনাথ

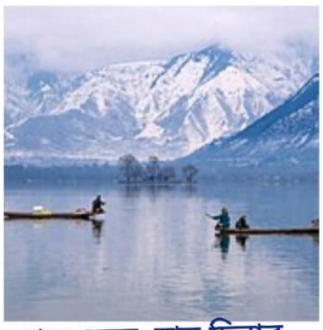

ডাল লেক, চার চিনার

শালিমার বাগ

টিউলিপ গার্ডেন

রওজা বল

হযরত বল

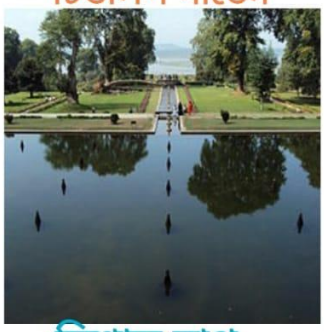

নিশাত বাগ

ক্ষীর ভবানী মন্দির

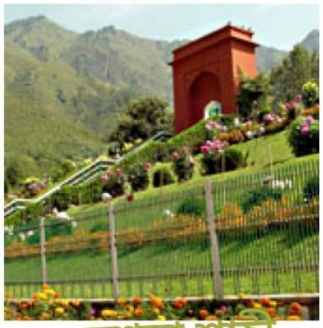

চশমা শাহী

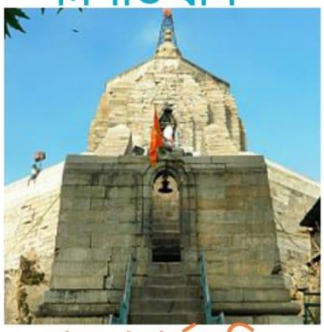

শঙ্করাচার্য মন্দির

সোনমার্গ

পিসু টপ

BANGLADARSHAN.COM

শেষনাগ লেক

মহাগুনাস টপ

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথের রাস্তা

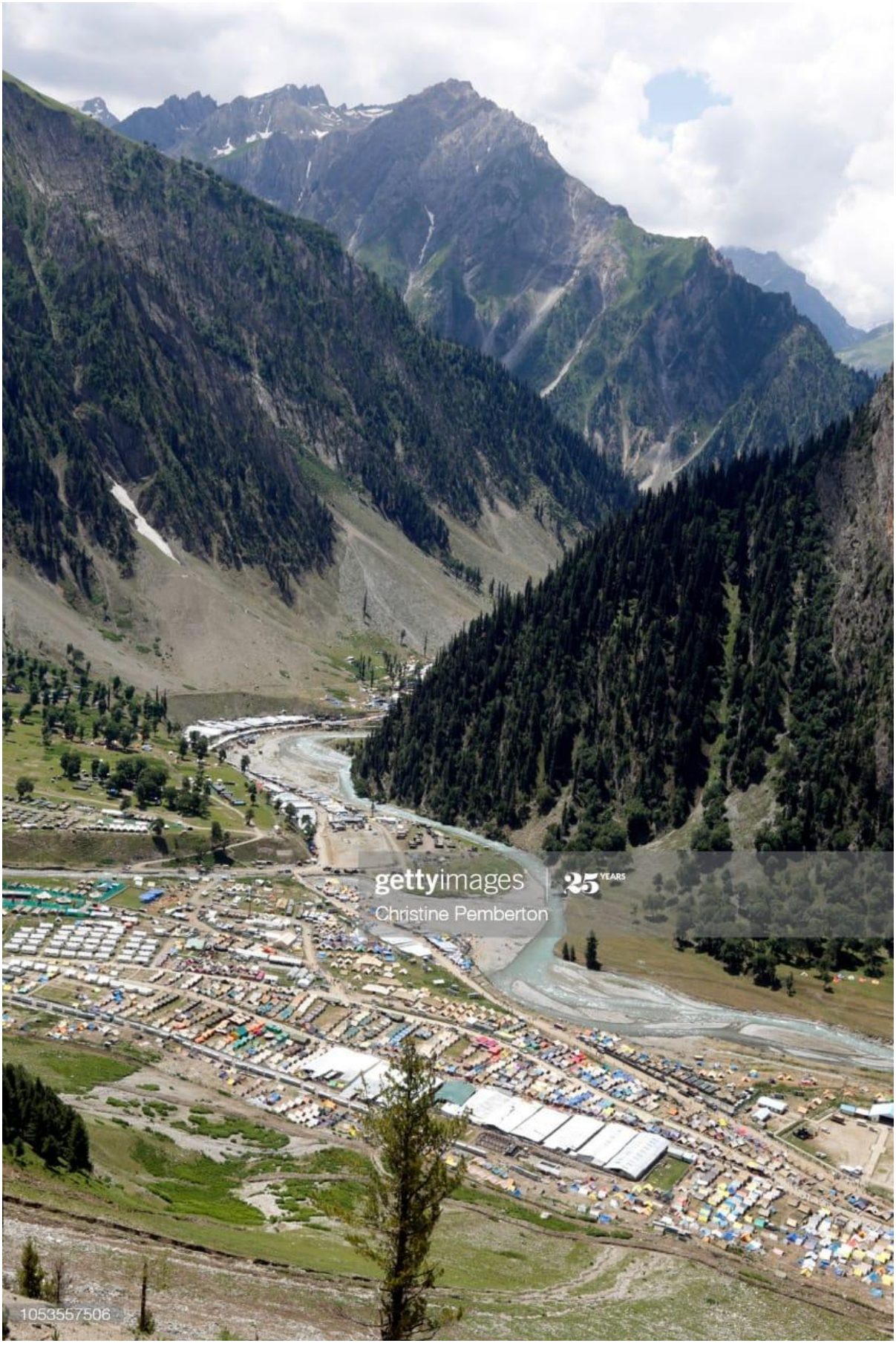

বলতালের রাস্তা

পঞ্চতরণী

BANGLADARSHAN.COM

॥জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ দর্শন॥

জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম:

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথমচ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালম ওংকারেত্বমামলেশ্বরম॥
পর্ল্যাং বৈদ্যনাধংচ ঢাকিন্যাং ভীম শংকরম।
সেতুবংধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে॥
বারণাশ্যাংতু বিশ্বেশং ত্রয়াম্বকম গৌতমীতটে।
হিমালয়েতু কেদারং ঘৃষ্ণেশংতু বিশালকে॥

এতানি জ্যোতির্লিঙ্গনী সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি॥

আর রুদ্রাষ্টকম স্তবটি:

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথ নাথং সদানন্দ ভাজাম।
ভবদ্ভবয় ভূতেশ্বরং ভূতনাথং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমীডে॥ ১॥

গলে রুন্ডমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকাল কালং গণেশাদি পালম।
জটাজূট গংগোত্তরংগৈ র্বিশালং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমিডে॥ ২॥

মুদামাকরং মন্ডনং মন্ডয়ংতং
মহা মন্ডলং ভস্ম ভূষাধরং তম।
অনাদিং হ্যপারং মহা মোহমারং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমিডে॥ ৩॥

জটাধো নিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপ নাশং সদা সুপ্রকাশম।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমিডে॥ ৪॥

BANGLADARSHAN.COM

গিরীংদ্রাত্মজা সংগৃহীতার্ধদেহং
গিরৌ সংস্থিতং সর্বদাপন্ন গেহম।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির-বংদ্যমানং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমিডে॥ ৫॥

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাম্ভোজ নম্রায় কামং দদানম।
বলীবর্ধমানং সুরাণাং প্রধানং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমিডে॥ ৬॥

শরচ্চংদ্র গাত্রং গণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম।
অপর্ণা কলত্রং সদা সচ্চরিত্রং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমিডে॥ ৭॥

হরং সর্পহারং চিতা ভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারং।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং,
শিবং শংকরং শম্ভু মীশানমিডে॥ ৮॥

BANGLADARSHAN.COM

দেবতাত্মা হিমালয় আর তাঁর গিরিগুহায়, নদীতীরে, কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে রয়েছে কত না দিব্যধাম, পুণ্যক্ষেত্র আর পীঠস্থান। হিমালয় দেবভূমি আর শিবক্ষেত্র গাড়োয়াল সেই দেবভূমির অংশ বিশেষ। সেই গাড়োয়াল হিমালয়ের অন্তর্গত ছোটা চারধাম, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রী। এই চারধামের প্রথমটি কেদারনাথ, যেটি একটি শিবক্ষেত্র এবং হিমালয়ের কোলে একমাত্র জ্যোতির্লিঙ্গ, যা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তর্গত। ভারতের মানচিত্রে উত্তরে কেদারনাথ থেকে দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত একই সরল রেখায় অবস্থিত। মহেশ্বর শিব স্বয়ং মোক্ষদাতা। হিন্দু শাস্ত্র মতে জীবন মৃত্যুর এই চক্র থেকে মুক্তি দিয়ে মোক্ষ দান করেন শিব। তাই তো আবহমান কাল ধরে মোক্ষলোভী মানুষ বারবার ছুটে যান আশুতোষ দেবাদিদেবের দরবারে।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে॥
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকাল, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি-আমি চাহি তোমা-পানে।

স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর–
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কখনো কখনো নিজেকে যখন এই বিশাল পৃথিবীর বিপরীতে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাই, সেসব সময়ে মাঝে মাঝে রবিঠাকুরের এই গানটির কথা মনে পড়ে। আমাদের অসহায়ত্বটুকু যত বড়ই হোক, তার চেয়ে অসীমতর বিশাল এক আশ্রয় যে আমাদেরকে নীরবে ধারণ করে রেখেছে, তা মনে পড়লেই মন বিস্ময় আর স্বস্তি মাখানো এক উষ্ণ মুগ্ধতায় ভরে ওঠে। শিবের বয়স যত, কেদারনাথ ততটাই প্রাচীন। পঞ্চকেদার, হিমালয়ের কেদারখণ্ডের অন্তর্গত। কথিত আছে মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে স্বজন হত্যা ও ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হতে বেদব্যাসদেবের পরামর্শে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের রাজ্যভার অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিতের হাতে অর্পণ করে দ্রৌপদী সহ শিবের শরণাপন্ন হবার জন্য অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীতে যান, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবদের আত্মীয় হত্যার কারণেই শিব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নেওয়া নানান অসৎ পন্থা ও চাতুর্যে বিরক্ত হয়ে তাঁদেরকে দর্শন দিতে ছিলেন নারাজ। তাই তিনি কাশী থেকে অন্তর্ধান করে চলে আসেন হিমালয়ে। পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে পায়ে হেঁটে আসেন কেদারনাথ পর্বতে। শিবের খোঁজে এসে উপস্থি হন হিমালয়ে। হিমালয়ের গুপ্ত কাশীতে এসে তাঁরা উপস্থিত হলে শিব সেখানে নন্দী রূপ ধারণ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম তাঁকে চিনতে পেরে পেছন থেকে জাপটে ধরলে নন্দীর পেছনের পা আর লেজ তাঁর হাতে আসে আর নন্দীরূপী শিবের শরীরের বাকি অংশ মাটির নিচে অন্তর্হিত হয়। মহিষের কুঁজ খুলে পড়ে কেদার পর্বতে, সেই থেকে কেদারনাথের অবস্থান ওই কেদার পাহাড়ে। কেদারনাথের শিবলিঙ্গও তাই conical, কুঁজের আকৃতির। পরে সেই নন্দীরূপী শিবের কুঁজটি প্রকট হয় কেদারনাথে, সামনের বাহু প্রকট হয় তুঙ্গনাথে, নাভি ও পেট মদমহেশ্বরে, মুখ রুদ্রনাথে আর মাথা কল্পেশ্বরে। পঞ্চপাণ্ডব এই পাঁচ জায়গায় তপস্যা ও যজ্ঞ করে শিবকে তুষ্ট করে পাঁচটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়ে বদ্রীনাথে গিয়ে বিষ্ণুর আশীর্বাদ নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। মোক্ষ লাভের আশায় আজও প্রতি বছর কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন এই কেদার তীর্থে যেখানে তীর্থের তাপ সহ্য করে তীর্থপতির দর্শন ও প্রণাম করাই রীতি। আরেকটি মত বলে, একদা ভগবান নরনারায়ণ মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে পূজো করেন শিবের। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন শিব এবং কেদারে বাস করতে শুরু করেন। সেই থেকে কেদারে বাস দেবাদিদেবের।

BANGLADARSHAN.COM

হরিদ্বার থেকে কেদার-বদ্রীর রাস্তায় পেরোতে হয় পঞ্চপ্রয়াগও। এই পঞ্চ প্রয়াগ হল বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ ও দেবপ্রয়াগ। প্রয়াগ শব্দটি দুটি বা তিনটি নদীর মিলনস্থল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অলকানন্দা নদী বদ্রীনাথের পিছনে শতপন্থ হিমবাহ থেকে আগত আর ধৌলীগঙ্গা এসেছে নীতি পাস থেকে, অলকানন্দার সঙ্গে ধৌলীগঙ্গার মিলন হয়েছে যোশীমঠ-বদ্রীনাথের রাস্তায় বিষ্ণুপ্রয়াগে, অলকানন্দা নন্দাকিনীর সঙ্গে যেখানে মিলেছে সেটি নন্দপ্রয়াগ, পিণ্ডারী নদী ও অলকানন্দার মিলনস্থল ও মহাভারতের অন্যতম প্রধান যোদ্ধা দানবীর কর্ণের তপস্যাস্থল কর্ণপ্রয়াগ, অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর মিলনস্থল হল রুদ্রপ্রয়াগ আর

যেখানে ভাগীরথী ও অলকানন্দা মিলেছে সেটি দেবপ্রয়াগ। এই রাস্তার প্রথম প্রয়াগ দেবপ্রয়াগ আর এই দেবপ্রয়াগ থেকে শুরু পতিতপাবনী গঙ্গার সমতলে এসে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে চলা।

কেদারনাথের রাস্তায় গৌরীকুণ্ডের আগে হর-পার্বতীর বিবাহ স্থল হিসেবে পরিচিত ত্রিযুগীনারায়ণ, যেখানে ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে বিষ্ণুকে সাক্ষী রেখে হর পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল, যার যজ্ঞের অগ্নি আজও প্রজ্জ্বলিত আর যেখানকার যজ্ঞ ভস্ম যারা সন্তানহীনতায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের সন্তানলাভে সহায়ক আর যার দর্শন নাকি সফল দাম্পত্যের সহায়ক। এখানে আছে শোন নদ ও মন্দাকিনীর মিলনস্থল যেটি শোনপ্রয়াগ নামে পরিচিত।

সময়টা ২০০৩ সাল। মেয়ে সবে পাঁচে পড়েছে, তার স্কুলের সামার ভ্যাকেশন শুরু হয়েছে মে মাসের মাঝামাঝি। মেয়ের বাবা সেই সময় মাসের মধ্যে কুড়ি দিন ট্যুরে থাকে, তাই বাড়ি, অফিস, মেয়ের পড়াশোনা, স্কুল সব নিয়ে খুবই ব্যস্ত আমি। সময় সময় যেন হাঁপিয়ে উঠছি। সেবার আমরা ঠিক করলাম এবার কর্তা ফিরলে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতেই হবে। সেকথা বললামও ফেরার পরে। ফেরার পর যেদিন অফিসে গেল, সেদিন দুপুরের দিকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল যে কেদারবদ্রী যেতে চাই কিনা, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি এসে বলল যে কুন্ডু স্পেশালের সঙ্গে বুকিং হয়েছে হরিদ্বার টু হরিদ্বার, কারণ কলকাতা টু কলকাতার ট্রেন রেজারভেশন ওদের আগেই হয়ে গেছে, সঙ্গে টাকা ছিল না এক কলিগ সাহায্য করেছে। কেদার বদ্রী যাত্রায় কুন্ডু স্পেশাল বলেই দেয় যে হরিদ্বার থেকে গোটা রাস্তা তারা নিরামিষ খাবার দেবে কারণ এটা তীর্থক্ষেত্র আর গোটা রাস্তাই নিরামিষ বলয় বা গোবলয়। এরপর ঠিক হল আমরা রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী গিয়ে ওখান থেকে জনশতাব্দীতে হরিদ্বার যাব, এখান থেকে জনশতাব্দীর রেজারভেশন বা টিকিট কিছুই পাওয়া গেল না, সবটাই দিল্লীতে গিয়ে করতে হবে।

BANGLADARSHAN.COM

সেইমত মে মাসের শেষের দিকে আমরা রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে রাজধানী দিল্লী পৌঁছলাম বেলা এগারোটায়। কিন্তু জনশতাব্দীর টিকিট পাওয়া গেল না, দিল্লীতে তখন ৪৬ ডিগ্রি গরম চলছে, তার মধ্যে ছোটাছুটি করে এক ট্রাভেল এজেন্টের সাহায্যে এসি বাসের টিকিট কেটে তাতে চড়ে বসলাম, ৭০ সিটের বাসে ওই গরমের জন্য লোক মাত্র পনের জন, বাস দিল্লী থেকে বেলা তিনটেতে ছেড়ে আমাদের হরিদ্বারের গঙ্গার পোলের ওপর রাত নটায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেখান থেকে রিক্সাতে করে এসে উঠলাম সেই হোটেলে যেখানে কলকাতা থেকে কুন্ডু স্পেশাল তার আরো যাত্রী নিয়ে উঠেছে। পরেরদিন টা হরিদ্বারে থেকে হর কি পৌরিতে গঙ্গা আরতি দেখে তার পরেরদিন সকাল ছটায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। আমাদের গন্তব্য সীতাপুর যেখানে রাত্রিবাস করে পরেরদিন কেদারনাথ যাত্রা শুরু হবে। হরিদ্বার থেকে সীতাপুরের দূরত্ব ২৩০ কিমি।

আমাদের যাত্রা শুরু হল এখন,

ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।

এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক,
ফিরব না গো আর–
তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি
বিপদ বাধা নাহি গণি ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও করি পার–
তোমারে করি নমস্কার॥

এখন রইল যাত্রা আপন ঘরে
চাব না পথ তাদের তরে ওগো কর্ণধার।
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার–
তোমারে করি নমস্কার॥

মোদের কেবা আপন, কে বা অপর,
কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার–
তোমারে করি নমস্কার॥

BANGLADARSHAN.COM

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল,
তুমি এখন ধরো গো হাল ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন,
ভাবনা কী বা তার–
তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা সহায় খুঁজে পরের দ্বারে
ফিরব না আর বারে বারে ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি
এই জেনেছি সার–
তোমারে করি নমস্কার॥

তিনটে বাস চলেছে কুম্ভু স্পেশালের, যাত্রী প্রায় দেড়শ, সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা আমার ছোট্ট মেয়ে, তাই সে একটু মনযোগও পাচ্ছে, বিশেষত দুজন ম্যানেজার, গৌতমবাবু আর রজত বাবুদের। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে তার সৌন্দর্য সম্ভার ঢেলে সাজিয়েছে তার এই একান্ত আপনার রাজ্যটিকে। ভেবেছিলাম বাসে উঠে ঘুমোব, কিন্তু

এই আশ্চর্য সৌন্দর্য না দেখলে যে অপ্রাপ্তিতে দুঃখ হবে, ঘুরে ঘুরে বাস চলেছে গঙ্গার পবিত্র ধারাকে সঙ্গী করে, ঋষিকেশ ছাড়িতে ব্যাসীতে আমাদের প্রাতঃরাশ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে মাথায় রেখে বাস বিরতি দিল একটু। আবার চড়েইবেতি বলে এগোনো। হঠাৎ রাস্তার পাশে পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গল থেকে নিজেদের মধ্যে খেলা করতে করতে দুটো ধূসর রঙের হিমালয়ান জায়ান্ট কাঠবেড়ালী বাসের পাশের রাস্তায় পড়ল, পড়েই তীব্র বেগে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। যেতে যেতে দেখছি নদীর পাশের পাহাড়ের পাকদন্ডী বেয়ে লোকজন জিনিস পত্র নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে, কি কঠিন আর কষ্টসাধ্য তাদের জীবনযাপন। পাশের পাহাড়ের ওপরের রাস্তা দিয়ে আসছে একটা গাড়ি, একটু পরে আমাদের বাসের পাশ দিয়ে সেটা চলে গেল, এবার সেই পাহাড়টাতে আমাদের বাস চলেছে আর সেই গাড়িটা আমরা যেখানে ছিলাম, সেখান দিয়ে চলেছে। পথে পেরিয়ে এলাম ঋষিকেশ, লছমনঝুলা, দেবপ্রয়াগ। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু ভাবছি সত্যিই দেবভূমি, ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মা নিহিত আছে এই স্থানগুলিতে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে একটা গেছে কেদারনাথ আর একটা যোশীমঠ হয়ে বদ্রীনাথ। মাঝে শ্রীনগরে দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা অগস্তমুনি, গুপ্তকাশী, ফাটা, কুন্ড ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি সীতাপুরের দিকে, অবশেষে বেলা চারটেতে আমরা পৌঁছলাম সীতাপুর, ওখানে পাহাড়ের কোলে একটা হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হোটেলের পাশেই রাস্তা আর রাস্তার পরেই খাদ, ঘন পাইন বনের জঙ্গল নীচে, তার ঠিক পেছনে দৃশ্যমান কেদারনাথ শৃঙ্গ, পূর্ণিমা নিকটে বলে সে যেন রাত্রে রূপোর মুকুট পরে আহ্বান করছে, আর চারদিকে তারায় ভরা আকাশ, হোটেলের বারান্দা থেকে যেন ছোঁয়া যায়, যদিও ঠান্ডার জন্যে বাইরে দাঁড়ানো বেশ কষ্টকর।

BANGLADARSHAN.COM

পরেরদিন ভোরে উঠে স্নান সেরে তৈরী হতে হল, সেদিন শোনপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ যাত্রা। বেশিরভাগ জিনিস সীতাপুরে রেখে শুধু শুখনো খাবার, জল, রেনকোট, ছাতা, একসেট করে ধোয়া জামাকাপড় পুজো দেবার জন্য আর গরম জামাকাপড় নিয়ে বাসে উঠলাম, বাস শোনপ্রয়াগ দিয়ে গৌরীকুণ্ডে দাঁড়াল।

গৌরীকুন্ডের উষ্ণ প্রস্রবন দেখে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কেউ ঘোড়া নিল, কেউ ডান্ডি নিল, কেউ কান্ডি নিল। সকলেই লাঠি নিল পাহাড়ে চড়ার জন্য, লাঠি আমরাও নিলাম আর নিলাম মেয়ের জন্য একটা পিট্ঠু আর লাগেজের জন্য একজন পোর্টার। কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় পাহাড়ে ঘোরার ব্যাপারে একজন শিক্ষক বলে দিয়েছিলেন যে ঘোড়ায় গেলে পুণ্য ঘোড়ায় পায়ে, ডান্ডি/কান্ডিতে গেলে পুণ্য ডান্ডি/কান্ডি ওয়ালাদের, নিজের পায়ে গেলে পুণ্য নিজের। শুরু হল যাত্রা। ভ্রমণকে কেন শিক্ষার অঙ্গ বলে এই যাত্রায় এলে বোঝা যায়। ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ শান্তির আশায় বারে বারে ছুটে আসে তীর্থদেবতার কাছে তার তাপ নাশের প্রার্থনা নিয়ে। ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী সকলেই মোক্ষ লাভের আশায় এগিয়ে চলেছে। তীর্থপথের তাপ সহ্য না করলে তপস্যা হবে কি ভাবে আর তীর্থের ফল তীর্থপতি বরদান করবেন কেন? বাবা কেদারনাথ যে স্বয়ং আশুতোষ, ভক্তবৎসল, পরম কারুণিক, তিনি শুধু চান ভক্তের নিখাদ ভক্তি আর প্রেম। করুণানিধান মহাদেব বারে বারে তাঁর ভক্তকে আহ্বান করেন তাকে অভয়পদের আশ্বাস দিতে। রাস্তায় চলতে চলতে ভাবছি এই পথ ধরে যুগে যুগে কত যোগী, সাধু, মহাত্মা, সন্ত গেছেন সেই পরম পুরুষের টানে, কত মহানের পদ

রজঃ মিশে রয়েছে এই পথের ধূলিকণায়। পথ কিন্তু দুর্গম, তার মধ্যে ঘোড়ার নাদি আর বৃষ্টির জলে পুরো রাস্তাই কর্দমসিক্ত, তার সঙ্গে ঘোড়ার নাদের কটু গন্ধ মিশে একেবারে পিচ্ছিল রাস্তা দুর্গন্ধে ভরে রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকেরই নিম্নবাস কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। তবু এগিয়ে চলা তাঁর ডাকে সারা দিতে, সত্য সুন্দর শিব ডেকে এনেছেন কৃপা করে, সেই কৃপায় সব বাঁধা দূরে সরিয়ে তিনি টেনে নিয়ে চলেছেন, এই যাত্রার তিনিই যে কর্ণধার, আমরা তাঁর অনুসারী মাত্র। সকল বাঁধা ঘুচিয়ে যিনি টানছেন, তাঁর কৃপা না হলে সব পর পর তিনি সাজিয়ে দিচ্ছেন কেন? পাহাড়ী পাকদন্ডী বেয়ে রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠেছে, একটু চললেই হাঁপ ধরছে, কিন্তু এমনি অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে একটু দাঁড়িয়ে তাকে দেখে "ওঁ নমঃ শিবায়" জপ করতে করতে আবার একটু শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলা। পথের একদিকে খাড়া পাহাড়, আর একদিকে খাদ, সেই খাদের পাশ দিয়ে নীলবর্ণা অপরূপা মন্দাকিনী ছুটে চলেছে আর তার অপর পাড়ে পাহাড়ের কোলে অজস্র ভেড়া চরছে, রাস্তা একটু নিস্তব্ধ হলে তাদের গলার ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসছে। কেদারনাথ শৃঙ্গের পেছনে চোরাবাড়ি তাল থেকে বেরিয়েছে মন্দাকিনী নদী, যা কেদারনাথের গোটা রাস্তাতেই নিরন্তর সঙ্গ দান করে ছুটে চলেছে তার সঙ্গমের দিকে। গৌরীকুন্ড থেকে কেদারনাথ তখন ছিল ১৪ কিমি রাস্তা।

মেয়ের পিঠ্ঠুর সাথে চলেছে তার বাবা, পিঠ্ঠুর লোকটি পাহাড়ী মানুষ, তার কাছে এই রাস্তা অনায়াসে চলার উপযোগী, আর মেয়ের বাবা সাথে তাল রাখতে গিয়ে প্রায় ছুটছে, যেখানে আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলছে, "বুঝলে হাঁটু খুলে হাতে চলে আসবে ওর সাথে তাল দিতে গিয়ে", বলেই আবার দৌড়োচ্ছে। চলতে চলতে আমরা কয়েক জায়গায় দাঁড়িয়েছি, লেবুর জল আর ছোলা সেদ্ধ খেয়েছি, ক্রমে পেরিয়ে এলাম রামওয়ারা, গরুড়চটি। রামওয়ারা থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েই বৃষ্টি নামলো, রেনকোট বার করতে করতে ভিজে গেলাম, আর গরুড় চটিতে মেয়ের বাবার ভালো লাঠিটা কেউ নিয়ে একটা ভাঙা লাঠি রেখে গেল আমরা যখন লেবুর জল খাচ্ছিলাম। এভাবে এগিয়ে চলেছি, মনে মনে তারক ব্রহ্ম নাম জপ করে চলেছি। পথে আলাপ হল বেহালা থেকে আসা একটি পরিবারের সাথে, এটা তাদের দ্বিতীয় বার আসা, প্রথমবার তাদের কেদারনাথের দর্শন হয়নি পথে ধ্বস নামার জন্যে, এবার আবার এসেছেন দর্শনের জন্য, পরে শুনেছিলাম এবারেও তাদের দর্শন হয়নি ভদ্রলোকের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় গরুড় চটিতে। তারা ওখান থেকেই ফেরত আসে। ভগবান যে কতভাবেই তাঁর ভক্তের পরীক্ষা নেন!

ঠিক কেদারনাথের দুই কিলোমিটার আগে মুষলধারে বৃষ্টি নামল, সামনে পিছনে, আশে পাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না এমন বৃষ্টি, আমার চশমা পুরো ঝাপসা হয়ে গেছে, আর এমন জায়গায় যেখানে কোনো গাছপালা, বাড়ি ঘর কিচ্ছু নেই, চিন্তিত হয়ে করণীয় কি ভাবতে ভাবতে হাঁটছি, এমন সময় দেখি একটা ছোট্ট পাথরের তৈরী দোকানের ভেতর থেকে মেয়ে আর তার বাবা ডাকছে, গিয়ে দেখি সেটা একটা চায়ের দোকান, আমি ঢুকতেই দোকানদার দোকানের সামনের প্লাস্টিক আর চটের দরজাটা বন্ধ করে দিল বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচতে, আমাদের গরম দুধের ঘোরালো চা দিল, দেখি সেখানে আমাদের পিঠ্ঠুর লোকটি আর পোর্টার দুজনেই আছে, বেশ ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি থামলে আমরা বেরোলাম। ওই বৃষ্টিতে ওই দোকানে আশ্রয় না পেলে জানিনা কি হতো।

BANGLADARSHAN.COM

আবার হাঁটতে হাঁটতে শেষে বেলা প্রায় চারটে নাগাদ পৌঁছলাম কেদারনাথ। দেখি মন্দাকিনীর পুলের ওপর ম্যানেজার গৌতমবাবু আর রজতবাবু দাঁড়িয়ে, বললেন, "সবাই এসে গেছে, আপনিই লাস্ট", আমার দেরী দেখে ওঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। কেদারনাথে আমরা ছিলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘের দোতলার একটি ঘরে।

সেই ঘরে ঢুকে দেখি মেয়ে আর তার বাবা মালপত্র সহ আগেই সেখানে স্থিত, সঙ্গে রয়েছেন সুভাষদা আর শিপ্রাদি বলে এক বয়স্ক দম্পতি, যাঁরা আমাদের মতো হেঁটে এসেছেন, কিন্তু পথের তুষার বৃষ্টিতে সুভাষদার ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হয়ে মুখ বেঁকে গেছে, তার ওপর দুজনেরই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। মেয়ের বাবার, মেয়ের, আমারও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এদিকে মেয়ের বাবার জিন্সের প্যান্ট, উলের মোজা, জুতো সব ভিজে একসা। ঘরে চা দিতে এসে স্থানীয় ছেলেটি আমায় পরামর্শ দিয়ে গেল যে যেখানে জেনারেটার চলছে সেই জায়গার আশে পাশে এই জিনিসগুলো মেলে দিতে, জেনারেটরের ধোঁয়াতে একটু শুকোবে, তাই করলাম, তার পরে গেলাম সন্ধ্যারতি দেখতে। অপূর্ব সেই আরতি কিন্তু শীতে যে জমে যাচ্ছি, সেদিন ছিল ওখানে মাইনাস তিন ডিগ্রী তাপমাত্রা। তাই ফিরে এসে আর খাবার জন্য নীচে নামিনি, সকলেই সুভাষদা, শিপ্রাদি সহ ওখানে বলে গরম জল নিয়ে দুধ গুলে, বিস্কুট, মিষ্টি, কাজু কিসমিস দিয়ে রাত্রের খাবার খেয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোকা খেলাম ঘরের সকলে ওই শ্বাসকষ্ট লাঘব করতে। বেশ আরাম হল, শোবার আগে ম্যানেজার গৌতমবাবু বলে গেলেন জানলা একটা খুলে শুতে, কারণ অক্সিজেন ক্রাইসিস হতে পারে এতো উঁচুতে। তাই করা হল। বাইরে তখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্ছে প্রকৃতি, চারিদিক এক অপার্থিব আলোয় ভরে গেছে, জানলা দিয়ে সেই সৌন্দর্য সুধা দুচোখে ভরে নিতে নিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। পরেরদিন ভোরে কর্তা ডেকে দিলেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে সকালের আরতি আর পুজো দেখতে যাবার জন্য। কিন্তু কর্তার প্যান্ট, মোজা সবই তো ভিজে, লাগেজ ভিজে যাবার ভয়ে তিনি দ্বিতীয় সেট প্যান্ট, মোজা আনেননি, শেষে তাঁর উলের ড্রয়ারের ওপরে আমার সালোয়ার চাপিয়ে আর উর্ধাঙ্গে উলিকটের গেঞ্জি আর তার ওপর সোয়েটার চাপিয়ে মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখলাম, শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে লিঙ্গাষ্টকাম পাঠ করতে করতে পুজো দিলাম। পাশে আদি শঙ্করাচার্যের সমাধি দর্শন করে প্রাণের প্রণতি জানালাম তাঁকে, কারণ তিনি না থাকলে আজকের হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান কে করতেন?

BANGLADARSHAN.COM

লিঙ্গাষ্টকাম স্তোত্র:

ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিঙ্গং
নির্মলভাসিত শোভিত লিঙ্গম।
জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ১॥

দেবমুনি প্রবরার্চিত লিঙ্গং
কামদহন করুণাকর লিঙ্গম।

রাবণ দর্প বিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ২॥

সর্ব সুগন্ধ সুলেপিত লিঙ্গং
বুদ্ধি বিবর্ধন কারণ লিঙ্গম।
সিদ্ধ সুরাসুর বংদিত লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ৩॥

কনক মহামণি ভূষিত লিঙ্গং
ফণিপতি বেষ্টিত শোভিত লিঙ্গম।
দক্ষ সুয়জ্ঞ নিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ৪॥

কুঙ্কুম চন্দন লেপিত লিঙ্গং
পঙ্কজ হার সুশোভিত লিঙ্গম।
সঞ্চিত পাপ বিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ৫॥

BANGLADARSHAN.COM

দেবগণার্চিত সেবিত লিঙ্গং
ভাবৈ-র্ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম।
দিনকর কোটি প্রভাকর লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ৬॥

অষ্টদলোপরিবেষ্টিত লিঙ্গং
সর্বসমুদ্ভব কারণ লিঙ্গম।
অষ্টদরিদ্র বিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ৭॥

সুরগুরু সুরবর পূজিত লিঙ্গং
সুরবন পুষ্প সদার্চিত লিঙ্গম।
পরাত্পরং পরমাত্মক লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥ ৮॥

লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যয়ং যঃ পঠেশ্শিব সন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥

কেদারনাথ বেড়ানোর সবচেয়ে ভাল সময় হল গ্রীষ্মকাল। সাইট সিয়িং-এর জন্য আদর্শ সময়। বর্ষাকালে সাধারণত কেউ যায় না কেদারে এবং শীতকালে প্রায় ছ'মাসের কাছাকাছি কেদারনাথ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। স্থানীয় লোকজনও থাকেন না ওইসময়। শিব তখন থাকেন গুপ্তকাশী বা উখিমঠে। কেদারনাথের মতো বরফ খুব কমই দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগে শোনপ্রয়াগ থেকে যাত্রা শুরু করে গৌরীকুণ্ড, জঙ্গল চটি, চিরবাসা ভৈরব ভীমবলি, রামওয়াড়া, গরুড় চটি হয়ে কেদারনাথ পৌঁছতেন যাত্রীরা। ২০১৩-র বিপর্যয়ে ধুয়েমুছে গিয়েছে রামওয়াড়া থেকে বাকি পথটা। এখন শুনেছি ভীমবলি থেকে লিঞ্চোলি, বদিয়ারপুছ হয়ে কেদারনাথ মন্দিরে পৌঁছতে পারেন দর্শনার্থীরা। আবার লিঞ্চোলি থেকে বদিয়ারপুছ পুরো রাস্তাই বরফের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। হেলিপ্যাডও রয়েছে এখানে। দু'ধারে দশ-বারো ফুট দেওয়াল মাঝে বরফের ওপর চলার পথ। শুধু বরফ আর বরফ, সঙ্গে অপরূপ মোহময়ী রহস্যঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তীর্থস্থানের স্নিগ্ধ বাতাবরণে এক ঐশ্বরিক পরিবেশ, নিমগ্ন হিমালয়ের গাম্ভীর্য-সবমিলিয়ে কেদারনাথ এক বিস্ময়কর দেবভূমি।

বর্তমান কেদারনাথের এই মন্দিরটি নির্মাণকর্তা আদি শঙ্করাচার্য। আদিতে যে মন্দিরটি ছিল সেটি পাণ্ডবরা নির্মাণ করেছিলেন। পুরাণের নানা দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে সাজানো মন্দির। মন্দিরের দরজায় নন্দীর বড় একটি মূর্তি রয়েছে। কথিত আছে, নন্দী নাকি শিবের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

এবার আবার নামার পালা। ভারত সেবাশ্রমে ফিরে এসে পিট্ঠুর লোকটি আর পোর্টার দুজনেই এসে গেছে, তাদের নিয়ে নীচে এসে বেরোনোর সময় গৌতমবাবু বললেন কিছু খেয়ে যেতে, দেখলাম গরম খিচুড়ি, তারকারি আর চাটনি প্লেটে প্লেটে সাজানো, একটা প্লেট নিয়ে তার থেকে তিনজনে একটু একটু খেয়ে এগোলাম, কারণ পেটভরে খেলে হাঁটতে কষ্ট হবে। নামার সময় ঠিক হল সেই দোকানটিতে গিয়ে ওদেরকে অন্তত আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে যাব আমরা, যে দোকানটি আমাদের আগের দিন ওই প্রচন্ড বৃষ্টিতে আশ্রয় দিয়েছিল। সেই মতো কেদারনাথের পায়ে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি জানিয়ে দুই কিমি নেমে এসে সেই দোকানটি খুঁজতে লাগলাম এগিয়ে, পিছিয়ে, কিন্তু কোনো দোকান, বাড়ি কিচ্ছু পাওয়া গেল না, আমাদের ঐভাবে খুঁজতে দেখে স্থানীয় কিছু লোক জিজ্ঞেস করলেন কি খুঁজছি, তাদের দোকানের কথা, আমাদের আশ্রয় দানের কথা সব জানালাম, তারা বললো গরুড় চটির পরে ওই জায়গা পুরো ফাঁকা মাঠের মতো, কোনো ঘরবাড়ি, দোকান ওখানে কখনো নেই। আমরা আগের দিনের কথা বলায় বললো, "হোগা কোই বাবাকা চমৎকার!" আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, এই ঘটনার ব্যাখ্যা আজও আমাদের অজানা।

BANGLADARSHAN.COM

বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছে গেলাম গৌরীকুণ্ড, ওখানে কুন্ডুস্পেশালের একটি বাস ভর্তি হলে আবার শোনপ্রয়াগ হয়ে চলে এলাম সীতাপুর। সেখানে রাত্রে থেকে পরেরদিন ভোরে যাত্রা শুরু হল বদ্রীনাথ ধামের উদ্দেশ্যে।

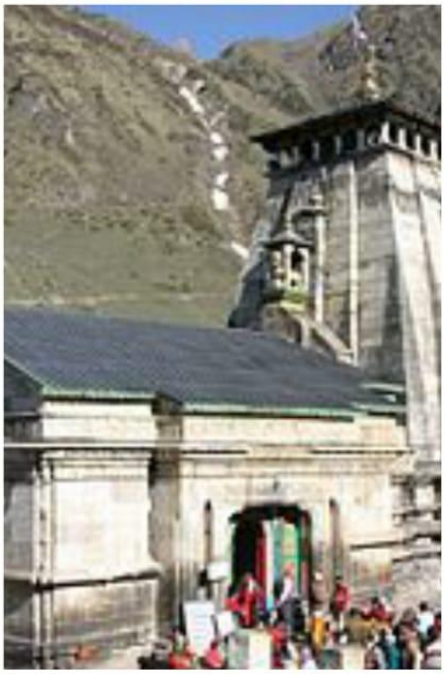

পঞ্চ কেদার

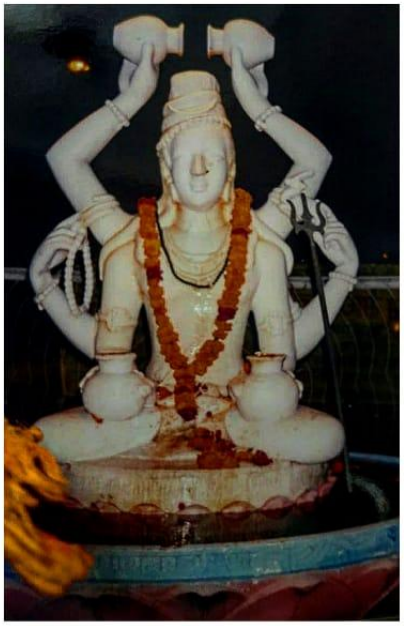

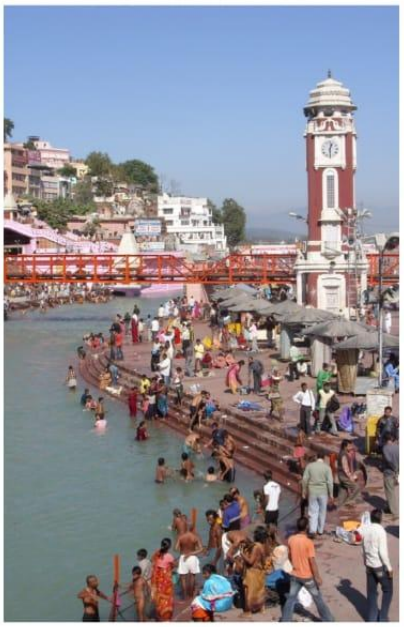

হরিদ্বার ও হর কি পেয়ারী

কেদারনাথের রাস্তা,
মন্দাকিনী

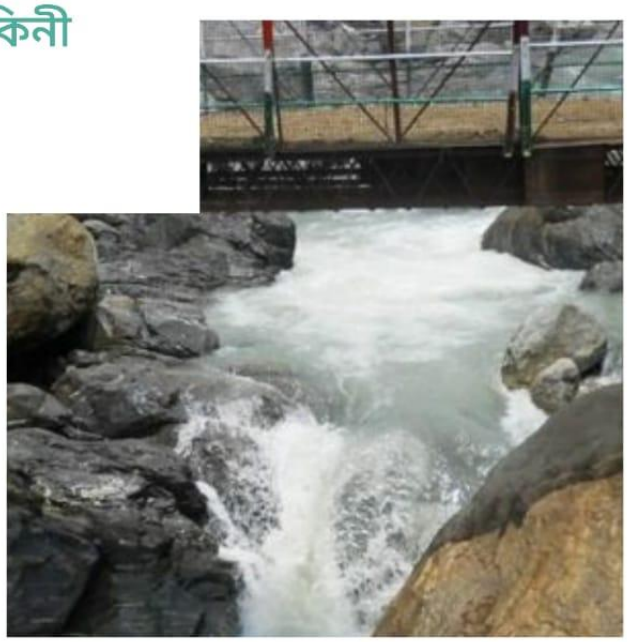

হরিদ্বারের হর কি পৌরি

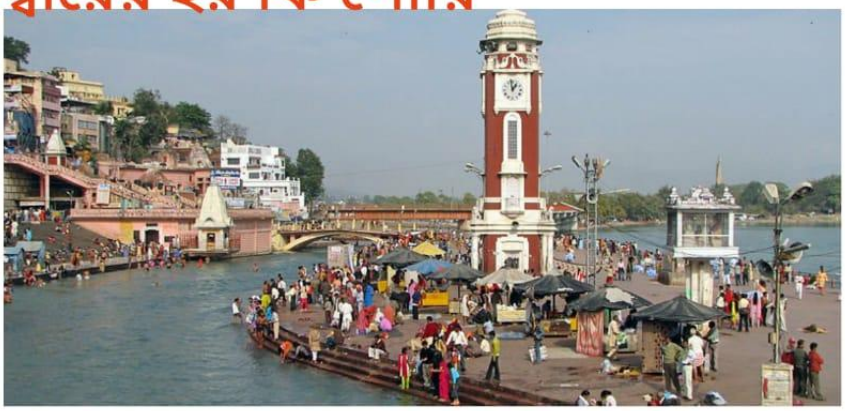

ঋষিকেশ

GAURIKUND TEMP

গৌরীকুন্ডের নানা দিক

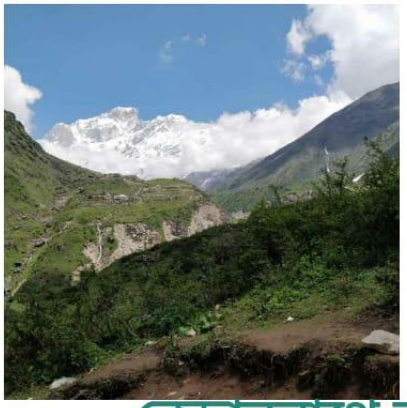

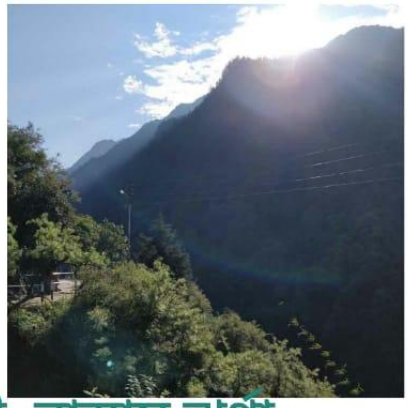

কেদারনাথে রাস্তা, রামধনু, পাকদণ্ডী, রাস্তায় ঝর্ণা

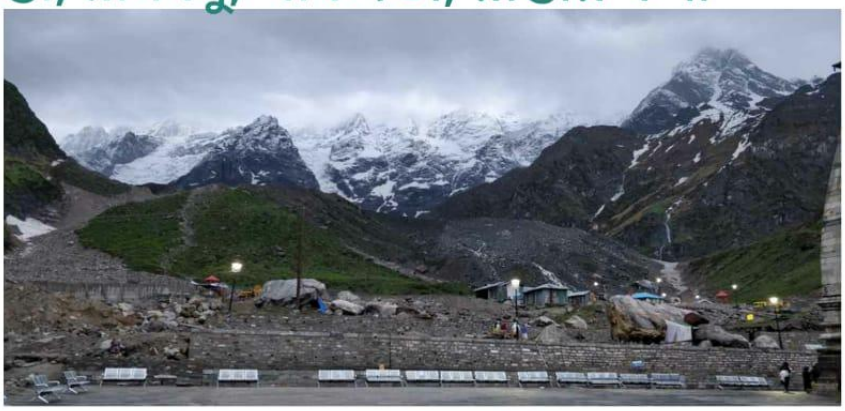

পঞ্চ প্রয়াগ

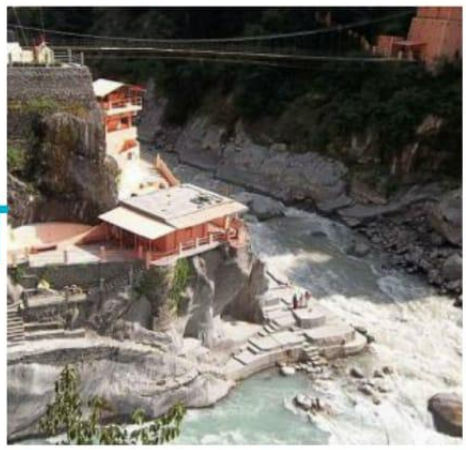

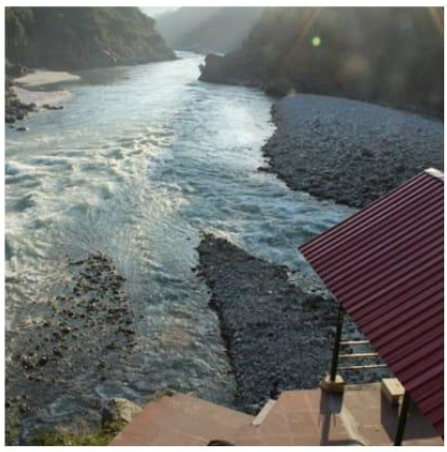

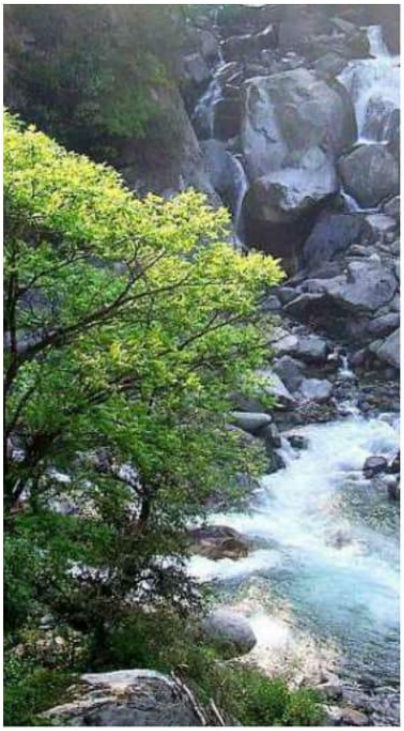

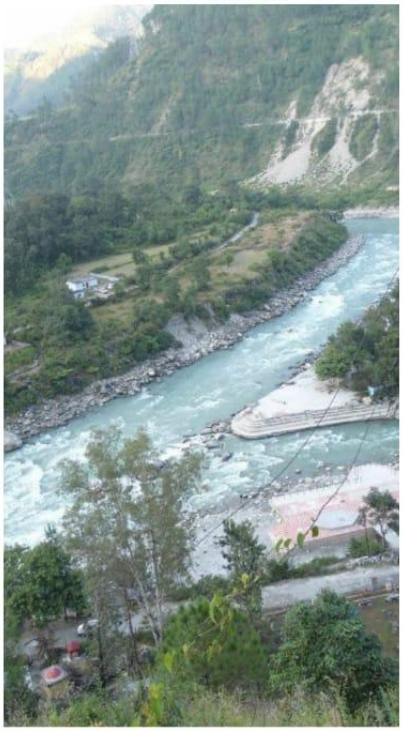

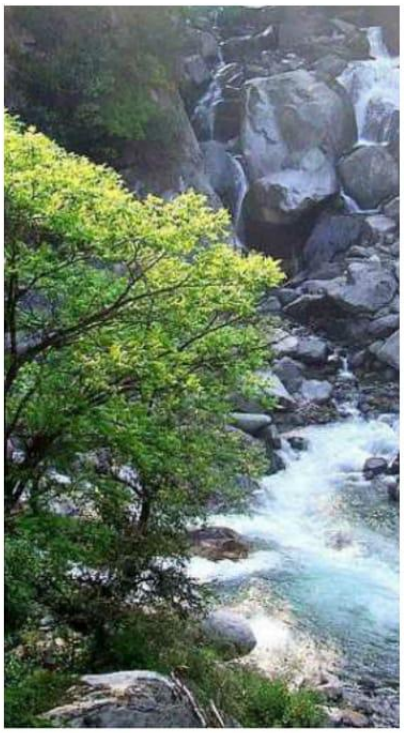

শোনপ্রয়াগ

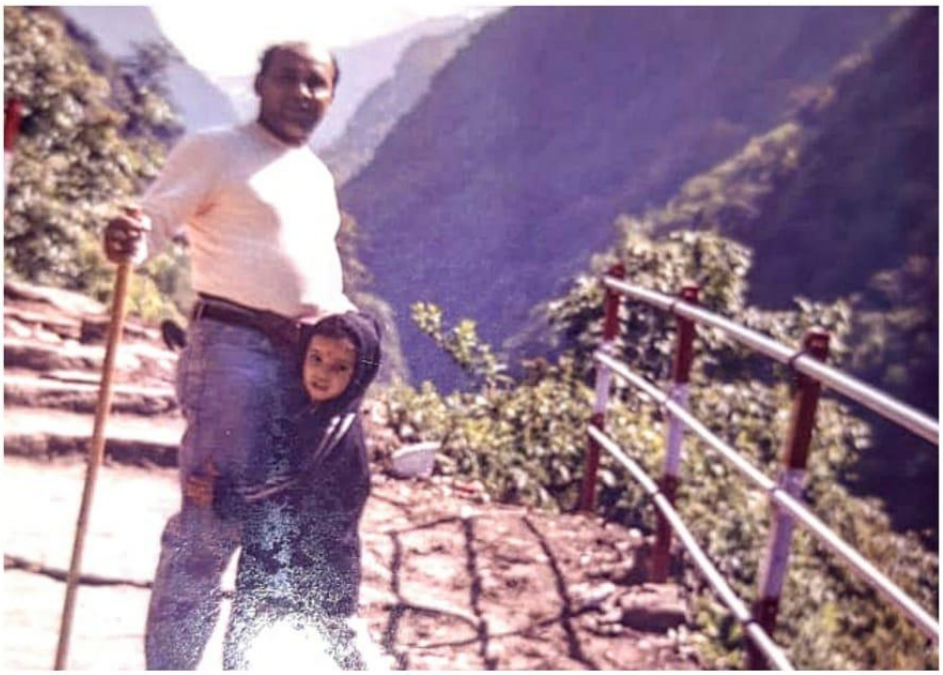

কেদারনাথের
রাস্তায় আমরা

কেদারনাথ মন্দির, লিঙ্গ আর
মন্দিরের সামনে আমরা

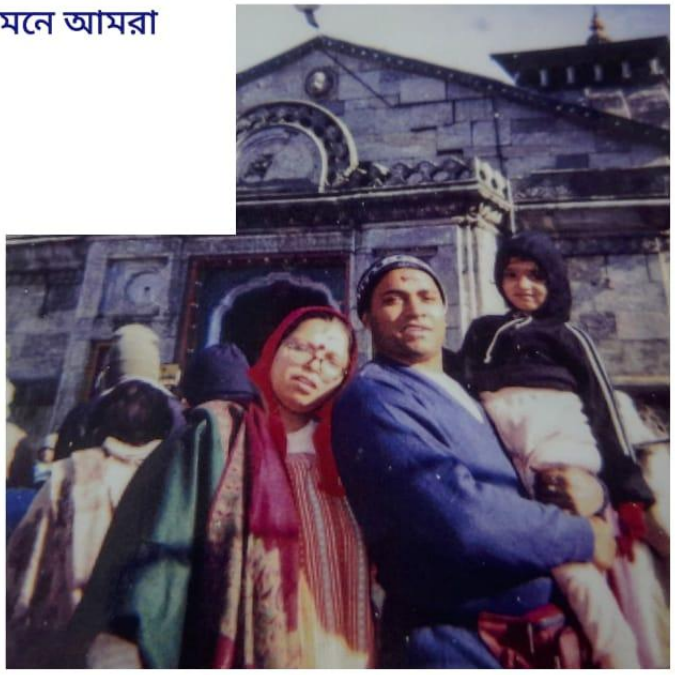

॥বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনারায়ণ দর্শন॥

হে নারায়ণ আদি কারণ অনন্তের অবতার
হর ব্রহ্ম পূজে তোমায় অতি অগোচর।

তুমি পরব্রহ্ম সাক্ষী রূপে কর লীলা অপার
করিছ সৃষ্টি পালিছ ভুবনমহান বিশ্বেশ্বর।

জয় নারায়ণ বেদ বিদামবর মায়ার অধীশ্বর
অনন্ত বিভূতি অঙ্গে সমাবৃত হে সত্ত্ব গুনাকর।
বিরাট পুরুষ বিশ্বমুরতি পর্ব লোকেশ্বর
প্রণতি জানাই তব শ্রীচরণে অদ্বৈত ব্রহ্মেশ্বর।

–শ্রীশ্রী সর্বানী মা

কেদারনাথ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ৫০ কিমি আর রুদ্রপ্রয়াগ থেকে যোশীমঠ ১১৫ কিমি, শীতকালে এই যোশীমঠেতেই বদ্রীনারায়ণ অবস্থান করেন ওপর থেকে নেমে এসে। যোশীমঠ থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলে রাস্তা ওয়ান ওয়ে, মানে হয় যাবার গাড়িগুলো একে একে চলে যাবে, উল্টো দিক থেকে কোনো গাড়ি সেই সময় ছাড়বে না আর সব গাড়ি শেষ হলে একদিকের তবেই আসার গাড়ি ছাড়বে। ওরা স্থানীয় ভাষায় বলে “গেট ধরা”, এর কারণ এই পথটুকু বেশ দুর্গম, রাস্তা সরু আর আগে পাশে বরফে ঢাকা। যোশীমঠ থেকে এখানে পৌঁছতে বেলা তিনটে হয়ে গেল, পর পর সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে আর ডান দিক দিয়ে ওপর থেকে একের পর এক গাড়ি নামছে। মেয়েকে নিয়ে তার বাবা নিচে নেমেছে, বাসের সহযাত্রীরা অনেকেই নেমেছে, এক তো দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটাতে তা ছাড়া হাতের এতো কাছ থেকে বরফ ঢাকা পাহাড় দেখবে বলে। বাস দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য সম্ভার এতই অপরূপ, যে দাঁড়ানো বাসে বসেও কিন্তু খারাপ লাগছে না। পাহাড়ের কোলে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত বরফে সাদা হয়ে আছে, আর রাস্তার নিচের দিকও বরফে ঢাকা, মাঝে মাঝে কিছু জায়গায় কাদার দাগ পড়ে শুধু সেই অংশটুকু কালো ছোপ ছোপ দেখাচ্ছে। চারপাশে হিমালয়ের তুষারাবৃত বিভিন্ন শৃঙ্গ আর উপত্যকার শেষে গেরুয়া সুতোর মতো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে গৈরিক অলকানন্দার ধারা। একটু পরেই হৈ চৈ শুনে দেখি মেয়েকে নিয়ে ওর বাবা বাসে উঠে আসছে, কারণ মেয়ে ওই রাস্তা থেকে বরফ খাচ্ছে আর গোল্লা পাকিয়ে এদিক সেদিক ছুঁড়ছে। একটু পরেই বাস ছাড়ল, সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় পৌঁছলাম বিষ্ণুক্ষেত্র বদ্রীনারায়ণ।

তদ্ বিষ্ণুং পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ,
দ্বিবীব চক্ষুরাতঃতাম

BANGLADARSHAN.COM

শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা–
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা-কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে,
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বদ্রীনারায়ণ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর মন্দির। বদ্রীনাথ শহর ও বদ্রীনারায়ণ মন্দির 'চারধাম' ও 'ছোটো চারধাম' নামে পরিচিত তীর্থগুলির অন্যতম। বদ্রীনাথ মন্দির 'দিব্য দেশম' নামে পরিচিত ১০৮টি বৈষ্ণব তীর্থেরও একটি। প্রতি বছর এপ্রিল মাসের শেষভাগ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ছয় মাস এই মন্দিরটি খোলা থাকে। শীতকালে হিমালয় অঞ্চলের তীব্র প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ওই সময় এই মন্দির বন্ধ রাখা হয়। উত্তর ভারতের উত্তরাখণ্ডের রাজ্যের চামোলি জেলায় গাড়ওয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অলকানন্দা নদীর তীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,১৩৩ কিমি (১০,২৭৯ ফু) উচ্চতায় বদ্রীনাথ মন্দিরটি অবস্থিত। বদ্রীনাথ ভারতের জনপ্রিয় তীর্থগুলির একটি। মন্দিরের প্রধান দেবতা বিষ্ণু 'বদ্রীনারায়ণ' নামে পূজিত হন। বদ্রীনারায়ণের ১ মি (৩.৩ ফু) উচ্চতার বিগ্রহটি কষ্টিপাথরে নির্মিত। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, এটি বিষ্ণুর আটটি 'স্বয়ং ব্যক্ত ক্ষেত্র' স্বয়ং-নির্মিত বিগ্রহের একটি। মন্দিরের উল্টোদিকে নর পর্বত অবস্থিত। অন্যদিকে নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের পিছনে নারায়ণ পর্বত অবস্থিত।

BANGLADARSHAN.COM

বদ্রীনাথ মন্দিরটি উত্তর ভারতে অবস্থিত হলেও এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা 'রাওয়াল'রা দক্ষিণ ভারতের কেবল রাজ্যের নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ-এ এই মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলিতেও এই মন্দিরের প্রধান দেবতা বদ্রীনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার থেকে অনুমান করা হয় যে বৈদিক যুগে (খ্রীস্টপূর্ব ১৭০০-৫০০ অব্দ) এই মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। কয়েকটি উপাখ্যান অনুসারে, এই মন্দিরটি খ্রীস্টিয় ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত একটি বৌদ্ধ ধর্মক্ষেত্র ছিল। ৯ম শতাব্দীতে আদি শঙ্কর এটিকে একটি হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। এই মন্দিরের স্থাপত্য বৌদ্ধ বিহারগুলির স্থাপত্যের অনুরূপ। মন্দিরের সুচিত্রিত প্রবেশদ্বারটিও বৌদ্ধ মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য। তা দেখেই কেউ কেউ এই মত প্রকাশ করেছেন। অন্য মতে, ৯ম শতাব্দীতে আদি শঙ্করই প্রথম বদ্রীনাথকে একটি তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, ৮১৪

থেকে ৮২০ সাল পর্যন্ত ছয় বছর তিনি এই অঞ্চলে বাস করেছিলেন। বছরে ছয় মাস তিনি বদ্রীনাথে ও বাকি ছয়মাস কেদারনাথে থাকতেন। হিন্দুরা আরও মনে করে যে, বদ্রীনাথের মূর্তিটি তিনিই অলকানন্দা নদী থেকে উদ্ধার করে তপ্তকুন্ড উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে, পারমার রাজা কনম পালের সাহায্যে আদি শঙ্কর এই অঞ্চলের সকল বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেছিলেন। রাজার বংশধরেরা বংশানুক্রমে এই মন্দিরের দেখাশোনা করতেন এবং মন্দিরের খরচ নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেছিলেন। মন্দিরের পথের গ্রামগুলি থেকে যে আয় হত তা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। পারমার শাসকদের 'বোলন্দা বদ্রীনাথ' (অর্থাৎ, 'কথা বলা বদ্রীনাথ') উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

বদ্রীনাথের সিংহাসনটি প্রধান দেবতার নামাঙ্কিত। ১৬শ শতাব্দীতে গাড়ওয়ালের রাজা বদ্রীনাথের মূর্তিটি বর্তমান মন্দিরে সরিয়ে আনেন। গাড়ওয়াল রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে বদ্রীনাথ মন্দির ব্রিটিশদের অধীনে আসে। তবে গাড়ওয়ালের রাজা মন্দিরের ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান রয়ে যান।

প্রাচীন এই মন্দিরটিকে বহুবার মেরামত করতে হয়েছে। ১৭শ শতাব্দীতে গাড়ওয়ালের রাজারা মন্দিরটিকে প্রসারিত করেন। ১৮০৩ সালের হিমালয়ের ভূমিকম্পে মন্দিরটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর জয়পুরের রাজা এটিকে পুনর্নির্মাণ করেন। ২০০৬ সালে রাজ্য সরকার বদ্রীনাথ-সংলগ্ন এলাকায় কোনো রকম নির্মাণ কাজ আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়।

BANGLADARSHAN.COM

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, এই স্থানে বিষ্ণু ধ্যানে বসেছিলেন। হিমালয়ের একটি অঞ্চলে মাংসভুক সন্ন্যাসী ও অসাধু লোকজন বাস করত। এই স্থানটি তার থেকে দূরে ছিল বলে বিষ্ণু ধ্যানের জন্য এই স্থানটিকে নির্বাচিত করেন। ধ্যানের সময় বিষ্ণু এখানকার দারুণ শীত সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তার স্ত্রী লক্ষ্মী একটি বদ্রী (কুল) গাছের আকারে তাকে রক্ষা করেন। লক্ষ্মীর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু এই অঞ্চলের নাম দেব বদরিকাশ্রম।
আটকিনসনের মতে (১৯৭৯), এই অঞ্চলে এক সময় একটি বদ্রী গাছের জঙ্গল ছিল। কিন্তু সেই জঙ্গল আজ আর দেখা যায় না। এই মন্দিরের বদ্রীনাথ-রূপী বিষ্ণুর মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। পুরাণ অনুসারে, এক ঋষি লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর পাদসেবা করতে দেখেন। তাই দেখে তিনি বিষ্ণুকে তিরস্কার করেছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণু বদ্রীনাথে এসে দীর্ঘ সময় পদ্মাসনে বসে তপস্যা করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে-এ বদ্রীনাথের উৎপত্তি সম্পর্কে আরেকটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যান অনুসারে, ধর্মের দুই পুত্র ছিল—নর ও নারায়ণ। এঁরা হিমালয়ের পর্বতরূপ ধারণ করেছিলেন। তারা ধর্মপ্রচারের জন্য এই স্থানকে নির্বাচিত করেন এবং হিমালয়ের বিভিন্ন বৃহৎ উপত্যকাগুলিকে বিবাহ করেছিলেন। আশ্রম স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গার অনুসন্ধানে এসে তারা পঞ্চবদ্রীর অন্যান্য চার বদ্রীর সন্ধান পান। এগুলি হল: বৃধাবদ্রী, যোগবদ্রী, ধ্যানবদ্রী ও ভবিষবদ্রী। অবশেষে তারা অলকানন্দা নদী পেরিয়ে উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবনের সন্ধান পান এবং এই স্থানটির নামকরণ করেন বদ্রীবিশাল।

ভাগবত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও মহাভারত-এর মতো প্রাচীন গ্রন্থে বদ্রীনাথ মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণ অনুসারে, "বদরিকাশ্রমে শ্রীভগবান (বিষ্ণু) নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। সকল জীবের কল্যাণের জন্য তাঁরা এখানে স্মরণাতীত কাল থেকে তপস্যা করেন।" স্কন্দপুরাণ-এ বলা হয়েছে, "স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল লোকে অনেক পবিত্র তীর্থ আছে। কিন্তু বদ্রীনাথের পবিত্র তীর্থ কোথাও নেই।" পদ্মপুরাণ-এ বদ্রীনাথের আশেপাশের এলাকাটিকে আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ বলা হয়েছে। মহাভারত-এ বলা হয়েছে, অন্যান্য তীর্থে মোক্ষ অর্জন করতে হলে ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। কিন্তু বদ্রীনাথের কাছে এলেই ভক্ত মোক্ষ লাভ করতে পারেন।

হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীরা বদ্রীনাথ মন্দিরে তীর্থ করতে আসেন। পঞ্চবদ্রী নামে পরিচিত পাঁচটি বিষ্ণু মন্দিরের একটি হল বদ্রীনাথ মন্দির। পঞ্চবদ্রী: বদ্রীনাথের বিশালবদ্রী; পাণ্ডুকেশ্বরের যোগধ্যান বদ্রী, সুবেনে জ্যোতির্মঠ থেকে ১৭ কিমি (১০.৬ মা) দূরে অবস্থিত ভবিষ্যবদ্রী, জ্যোতির্মঠ থেকে ৭ কিমি (৪.৩ মা) দূরে অনিমঠে বৃধবদ্রী ও কর্ণপ্রয়াগ থেকে ১৭ কিমি (১০.৬ মা) দূরে আদি বদ্রী। বদ্রীনাথ মন্দির হিন্দুদের পবিত্রতম চারটি তীর্থ 'চারধাম'-এর অন্যতম। চারধাম তীর্থগুলি হল–রামেশ্বরম, বদ্রীনাথ, পুরী ও দ্বারকা। যদিও এই মন্দিরের আদি ইতিহাস স্পষ্ট জানা যায় না, তবু অদ্বৈতবাদীরা আদি শঙ্করকে চারধামের প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন। আদি শঙ্কর ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করার সময় যে চারটি মন্দিরকে মঠের নিকটবর্তী মন্দির হিসেবে নির্বাচিত করেন সেগুলি হল: উত্তরে বদ্রীনাথে বদ্রীনাথ মন্দির, পূর্বে পুরীতে জগন্নাথ মন্দির, পশ্চিমে দ্বারকায় দ্বারকাধীশ মন্দির ও দক্ষিণে শৃঙ্গেরীতে সারদাপীঠ মন্দির।

BANGLADARSHAN.COM

ভারতের চার প্রান্তে অবস্থিত চারধাম মন্দিরগুলিতে জীবনে অন্তত একবার তীর্থ করতে যাওয়া হিন্দুরা পবিত্র কর্তব্য মনে করেন। প্রথাগতভাবে, এই তীর্থযাত্রা পূর্বদিকে পুরী থেকে শুরু হয় এবং রামেশ্বর ও দ্বারকা হয়ে বদ্রীনাথে পৌঁছায়। পুরীর জগন্নাথদেব প্রতি বছর একবার করে আমাদের ডাকেন, তাই তাঁর দর্শন আমাদের হয়েই যায়, সেদিক দিয়ে ভাবলে তিনি আমাদের আত্মজন।

আমাদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে বালানন্দ তীর্থাশ্রমের একটি ঘর, প্রচন্ড ঠান্ডা আর পথের ক্লান্তি দরুন সেদিন আমরা আর বেরোয়নি। পরেরদিন ভোরে তৈরী হয়ে গেলাম বিষ্ণুমূর্তি বদ্রীনারায়ণ দর্শনে, প্রথমেই মন প্রসন্নতায় ভরে গেল নর আর নারায়ণ পর্বতের মাঝখান দিয়ে নীলকণ্ঠ পর্বতের তুষারশুভ্র শৃঙ্গটির সৌন্দর্য দেখে, ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের এই অংশে বয়ে চলেছে গৈরিকবরনী অলকানন্দা। সেদিন এক রৌদ্রজ্জ্বল দিন, সমস্ত প্রকৃতি যেন তার অবগুণ্ঠন মুক্ত করে আপনার ক্রোড়ে আলিঙ্গন করতে চাইছে। নির্বাক বিস্ময়ে সেই রূপমাধুরী দেখতে দেখতে অলকানন্দার ওপরের সেতু পেরিয়ে এলাম পুজো দেবার লাইনে। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এখানে বসেই আদি শঙ্করের তাঁর সেই বারোজন শিষ্যদের শিক্ষা দান করেছিলেন আবার শিক্ষা শেষে পরীক্ষা নিয়ে প্রত্যকে শিষ্যকে তাঁর প্রার্থীত ফল দান করেছিলেন। মনে পড়ল ক্রিয়াযোগের প্রবক্তা শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাইয়ের গুরু মহাবতার বাবাজী মহারাজ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী মহারাজের পরের শরীর শ্রীনাঙ্গাবাবা এঁরা এই বদ্রীনারায়ণের কাছে ব্যাসপীঠে অবস্থান করেন। কিন্তু কোনো কোনো

ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। বদ্রীনারায়ণের সত্তা হিসেবেই মহাবতার বাবাজী মহারাজ এই অঞ্চলে বসেই কয়েক সহস্র বছর ধরে লোককল্যাণ করে চলেছেন তাঁর সন্ত মণ্ডলী দ্বারা। এইসব ভাবনার মাঝেই পৌঁছে গেলাম বদ্রীনারায়ণের সামনে, পুজো দিলাম। যিনি নিজেই পূর্ণব্রহ্ম তাঁকে আমার মত খন্ড সত্তা আর কি দিতে পারে একটু ভক্তি ও প্রেম ছাড়া?

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুনৈকসিন্ধো
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।

মন্দিরটি তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত: গর্ভগৃহ, দর্শন মণ্ডপ ও সভামণ্ডপ। গর্ভগৃহের ছাদটি শঙ্কু-আকৃতিবিশিষ্ট। এটি প্রায় ১৫ মি (৪৯ ফু)। এর মাথার সোনার গিলটি করা ছাদযুক্ত একটি ছোটো গম্বুজ রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগটি পাথরের তৈরি। এখানে খিলান-আকৃতির জানলা দেখা যায়। প্রধান প্রবেশপথটিও একটি সুউচ্চ খিলান-আকৃতির দরজা। একটি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে এই দরজার কাছে পৌঁছতে হয়। প্রধান প্রবেশদ্বার পার হলেই একটি বৃহদাকার ও স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপে উপস্থিত হতে হয়। এটি পার হলেই মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে যাওয়া যায়। উক্ত মণ্ডপের স্তম্ভগুলি ও দেওয়ালগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্যে চিত্রিত।

BANGLADARSHAN.COM

গর্ভগৃহে বদ্রীনারায়ণের ১ মি (৩.৩ ফু) উচ্চতার শালিগ্রাম (কষ্টিপাথর) বিগ্রহটি একটি বদ্রী গাছের তলায় সোনার চাঁদোয়ার নিচে রাখা আছে। বদ্রীনারায়ণের মূর্তির উপরের দুই হাত উত্তোলিত অবস্থায় শঙ্খ (শাঁখ) ও চক্রধরে আছে এবং নিচের দুটি হাত যোগমুদ্রায় (পদ্মাসন) উপবিষ্ট মূর্তির কোলের উপর ন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। গর্ভগৃহে বদ্রীনারায়ণ ছাড়াও সম্পদের দেবতা কুবের, দেবর্ষি নারদ, উদ্ধব, নর ও নারায়ণ ঋষির মূর্তি আছে। মন্দিরের চারপাশে পনেরোটি মূর্তি পূজা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, নারায়ণের বাহন গরুড় ও নবদুর্গার মূর্তি। এছাড়াও মন্দিরে লক্ষ্মীনৃসিংহ এবং আদি শঙ্কর (৭৮৮-৮২০ খ্রীস্টাব্দ), বেদান্তদেশিকা ও রামানুজের মন্দির আছে। মন্দিরের সকল মূর্তি কষ্টিপাথরে তৈরি।

ওঁ প্রণামামী হরিং বিষ্ণুং নারায়ণ গরুড় ধ্বজম
বাসুদেবং বিষ্ণুং শ্রীপতিং ভুবনেশ্বরং
নারায়ণং ত্রিলোকেশং চক্রপাণিং জনার্দর্নাং
অনন্তং পুণ্ডরীকাক্ষং গোবিন্দম নবকান্তকম
ভজ গোবিন্দম ভজ গোপালম
ভজ রাধাকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ রাধানাথ
ভজ নারায়ণ হরি শুদ্ধসত্ত্বং

মন্দিরের ঠিক নিচে তপ্তকুণ্ড নামে একটি উষ্ণ গন্ধক প্রস্রবন রয়েছে। এটির ঔষধিগুণ আছে বলে মনে করা হয়। অনেক তীর্থযাত্রী মনে করেন, মন্দিরে যাওয়ার আগে এই কুণ্ডে স্নান করা আবশ্যক। মন্দিরের দুটি পুকুরের নাম নারদ কুণ্ড ও সূর্যকুণ্ড।

তপ্তকুণ্ড দেখতে গিয়ে দেখলাম সেখানে যেমন অনেকেই স্নান করছেন আবার কেউ কেউ গরম জলের মধ্যে ডাল কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন সেদ্ধ করতে, নারদ কুণ্ড আর সূর্যকুণ্ড দর্শন করে বেরিয়ে গেলাম ব্রহ্ম কপালিতে, এখানে বসে আমরা আমার পরলোকগত শ্বশুর মশাইয়ের পিন্ড দান করলাম। আমাদের শাস্ত্র মতে এখানে পিন্ড দান করলে নাকি আর জন্মাতে হয় না। কিন্তু অতৃপ্ত বাসনা যদি কারুর থেকে যায়, তার সেই বাসনা পূরণের জন্যই তো আবার আসতে হয়। তারপর অলকানন্দার পুল পেরোনোর সময় ওখানে ভান্ডারা দিচ্ছিল, সেখান থেকে লুচি আর হালুয়া খেয়ে বালানন্দ তীর্থাশ্রমে ফিরলাম।

দুপুরে খিচুড়ি খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আবার গেলাম সন্ধ্যারতি দেখতে, ফিরতে ফিরতে শীতের আধিক্য অনুভূত হলো। পরের দিন যাওয়া হবে মানাগ্রাম আর ব্যাসগুহা। সকালে আরেকবার মন্দির দেখে গাড়িতে উঠলুম, গন্তব্য ভারতের শেষ গ্রাম 'মানা।' মন্দিরের দিকে চেয়ে দেখি, চূড়ার স্বর্ণকলসগুলো কাঁচা রোদের আলোয় ঝকঝক করছে। সকাল ১০টা বাজে, আমরা রওনা দিলাম তিন কিমি দূরে মানাগ্রামের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝে মাঝে পাহাড়ি ঝোরার জলে টায়ার ভিজিয়ে গাড়ি চলছে, কখনো খোলা কাঁচের মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে হিমশীতল ঝর্ণার জল। দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে গেলাম বুঝতেই পারলাম না। ঝকঝকে আবহাওয়া, পাশে পাশে চলছে নীলকণ্ঠ, নর-নারায়ণ আরো কত নাম না জানা হিমগিরি। তাদের গায়ের হিমবাহগুলো যেন শিরা-উপশিরার মত নামছে নদী হয়ে।

হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ হয়ে মানাগ্রাম অবধি পুরোটা একটিই জাতীয় সড়ক। কিন্তু এখানে এসে এই রাস্তার শেষ, এবার গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি পথ ধরতে হবে। স্বাগত জানাচ্ছে একটা বোর্ড, তাতে লেখা, ভারতের শেষ গ্রাম 'মানা'য় আপনাকে স্বাগত। গাড়ি পার্ক করে গেট পেরিয়ে ঢুকলাম মানাগ্রামে। দেখতে আর পাঁচটা গ্রামের মতোই, তাহলে এতো এতো লোক ছুটে আসে কেন? শুধু গ্রাম দেখতে? না, এই মানাগ্রাম শুধু ভারতের শেষ গ্রামই নয়, মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্বে আছে যে, এই মানা গ্রাম থেকেই শুরু হয়েছে স্বর্গের পথ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পরাজিত করে পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে ফিরে আসে। শ্রীকৃষ্ণ চলে যান দ্বারকায়, কিন্তু গান্ধারীর অভিশাপে সমস্ত দ্বারকা জলে নিমগ্ন হয়। যাদবকুল ধ্বংস হয়। শ্রীকৃষ্ণও এক ব্যাধের তীরে দেহত্যাগ করেন। পাণ্ডবরা উপলব্ধি করেন কুরুক্ষেত্রের এই মহাসংগ্রামে শুধু ইক্ষাকু বংশই নয় (কুরু-পান্ডব বংশ), প্রবলপ্রতাপী যাদববংশও ধসে পড়েছে। ভারতবর্ষে এখন এক নতুন রাজনীতির সূচনা হয়েছে, যা কিনা দ্বাপর যুগের অন্ত ঘোষণা করছে। শুরু হতে চলেছে কলিযুগ। ভারতের সমস্ত ছোট বড় রাজ্য তাদের ন্যায়িক ও অর্থনৈতিক অবনতির জন্য পান্ডবদের দোষারোপ করছে।

এমতবস্থায়, পান্ডবরা অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যের ভার দিয়ে মহাপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। সেইমত, তারপর শিবের দেখা পেয়ে পান্ডবরা আসেন এই মানাগ্রামে। এখান থেকে এই পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদীর যাত্রা শুরু হয় স্বর্গের পথে।

আমরাও যাত্রা শুরু করলাম, এখানে লোকজন খুবই গরীব। সামান্য কিছু চাষবাস আর ভেড়া আর অন্য পশুর লোম থেকে উল বানিয়ে উলের পোশাক বিক্রি করে এদের দিন কাটে। গ্রামের রাস্তা হলেও পাথুরে আর বেশ চড়াই, দুজন লোক পাশাপাশি কোনোরকমে যেতে পারে। তার ধারে ধারে গ্রামের বাড়ি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে, কেউ কেউ অবাক চোখে দেখছে। বাচ্চাদের হাতে একটা করে লজেন্স দিতেই কি খুশি। বাড়ির বয়স্ক মহিলারা উল বুনছেন রাস্তার ধারে, বিক্রিও করছেন উলের টুপি, মোজা, দস্তানা। মহিলাদের চামড়া কুঁচকে 'লোলচর্ম' যাকে বলে সেই অবস্থা। এখানকার চরম আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী। ও এখানে বলে রাখি, আমরা যেদিন গেছিলাম, সেদিন এখানকার তাপমাত্র ছিল -৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আরো খানিকটা এগোতেই রাস্তাটা ঠিক 'Y' মত দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকে আছে সরস্বতী নদীর উৎস, ভীমপুল, কেশবপ্রয়াগ আর ডানদিকে আছে ব্যাসগুহা ও গণেশগুহা। আমরা বাঁদিকের রাস্তাটাই আগে ধরলাম।

আরেকটু গিয়ে ডানদিকে দেখি একটা জলজ্যান্ত হিমবাহ। গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে গরফগলা জল, আর তার ছিটে এসে পড়ছে গায়েতে। রোদের আলোয় তৈরী হয়েছে সুন্দর রামধনু।

BANGLADARSHAN.COM

ভীষণ গর্জন, তীব্র জলোচ্ছ্বাস, আর মোহময়ী সৌন্দর্য এই হচ্ছে সরস্বতী নদী। নিচে আছে 'কেশবপ্রয়াগ', যেখানে এই সরস্বতী নদীই অলকানন্দায় মিশে গিয়ে একক ধারা তৈরী করেছে। আরেকটু সামনে থেকে দেখব বলে এগিয়ে গেলাম সরস্বতী মন্দিরের কাছে।

ছোট্ট মন্দির, পাশেই ঝর্ণা, ঠিক কোলের কাছে একটা চায়ের দোকান। লেখা আছে 'ভারতের শেষ চায়ের দোকান।'

এখান থেকে আরো সুন্দর লাগছে এই উৎসটিকে। দেখলুম, একটু আগে যে জায়গাটা থেকে সরস্বতী নদীকে দেখছিলাম, সেটা আসলে একটা বিশাল পাথর। এই পাথরের তলা দিয়েই নদী নেমে গেছে অলকানন্দার দিকে। স্বর্গারোহণের পথে দ্রৌপদী এই সরস্বতীর তীব্র স্রোত আর ভয়ানক জলোচ্ছ্বাস দেখে নদী পেরোতে ভয় পাচ্ছিলেন। তখন মহাবলী ভীম একটা পাথর দিয়ে এই ঝর্ণার ওপরে সেতুর মত স্থাপন করেন। এখনো দেখা যাচ্ছে আসলে একটা লম্বাটে গোলাকার মতন পাথরের চাঁই দিয়ে এই ব্রিজ বা 'পুল' বানানো হয়েছে। প্রাকৃতিক সেতু নয়, আবার অতিপ্রাকৃতিকও নয়! এই হল 'ভীমপুল' আর এই পাথরটি হল 'ভীমশিলা।'

ভীমশিলা পেরিয়ে সরু পাথরফেলা রাস্তা উঠে গেছে স্বর্গের দিকে। এই পথে অনেকটা গেলে পরে আছে বসুধারা ফলস। সেখান থেকে আরো কতদূর জানিনা, সতপন্থ তাল পেরিয়ে একটা জায়গা আছে যেখানে রাস্তা আর নেই। এই কি তাহলে স্বর্গ? না, বলা হয়, এই পাহাড়ের শেষে আসতে আসতেই পর্বতের দুর্গমতায় এক

এক জায়গায় একে একে দ্রৌপদী, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও ভীমের পতন হয়। অর্জুনের পতন হয় চক্রতীর্থে। শুধু যুধিষ্ঠির ধর্মরূপী সারমেয়কে সঙ্গে করে এই পথের শেষ সীমায় এসে পৌঁছন। সেখান থেকে তিনি সশরীরে স্বর্গরথে আরোহন করেন।

দেখে আবার ফেরার পালা, এখনো বাকি আছে গণেশগুহা আর ব্যাসগুহা। এ দিকটায় লোকজন বোধহয় একটু কম আসে। সত্যিই গুহা, কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একটা মন্দির মাত্র। মন্দিরের ভেতর দিয়ে কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে গুহায় ঢুকতে হয়, আর পুরোটাই পরিক্রমার সময় চার হাতেপায়ে হাঁটতে হচ্ছে। গুহার গায়ে অনেকে পয়সা আটকে রেখেছে। ভেতরে পাথুরে মূর্তি।

এই দুই গুহাও মহাভারতের সাথে যুক্ত। এখানে মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাস (বেদব্যাস বা ব্যাসদেব) মহাভারত লেখা শুরু করেন। লেখার জন্যে গণেশকে আনানো হয়, ব্যাস বলবেন আর গণেশ লিখবেন। কিন্তু গণেশের এক মহা জেদ, বেদব্যাস বলতে বলতে থেমে গেলে গণেশ আর লিখবেন না। ২৪ হাজার শ্লোকের মহাগ্রন্থ, থামতে তো হবেই। তাই ব্যাসও দিলেন মোক্ষম চাল। প্রতিটি শ্লোক লেখার সময় গণেশকে বুঝতে হবে সেই শ্লোকের অর্থ, তারপর লিখতে হবে। এইভাবে লেখা হল কুরুপান্ডবের ইতিহাস। ওজনে সমস্ত বেদ, পুরাণ, রামায়ণের থেকেও বেশি ভারী, তাই নাম হল মহাভারত (মহা+ভার)। পাথুরে রাস্তা দিয়ে উঠে গেলে প্রথমে পড়বে গণেশ গুহা, সেখান থেকে খানিকটা উঠে গেলে ব্যাস গুহা।

BANGLADARSHAN.COM

মানা গ্রাম দেখা শেষ, এবার ফেরার পালা। আবার সেই গ্রামের মধ্যে দিয়ে। দুপুর হয়েছে, রোদ উঠেছে মাথার ওপর। নিচে অলকানন্দার জলে ঠিকরে পড়ছে আলো। আমরা ফিরলাম গাড়িতে। পরের দিন ভোরে বদ্রীনারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে প্রথমে এলাম যোশীমঠ, সেখানে নরসিংহ মন্দির দেখে আউলিতে, আউলিতে তখন বরফ পাইনি আমরা ঠিকই, কিন্তু রোপওয়েতে উঠেছি, দৃশ্যমান হিমালয়ের অনেকগুলি তুষারাবৃত শৃঙ্গ দর্শন করেছি, রোপওয়ে করে যেখানে স্কি করে সেই জায়গাও দেখেছি, তারপর নিচে নেমে দুপুরের খাবার খেয়ে বেলা চারটেতে এসে পৌঁছেছি পিপলকোটি। এখানে এসেই মেয়ের কানে ব্যথা শুরু হল যা হরিদ্বারেও ছিল, হরিদ্বারে ডাক্তার দেখানো হল, তিনি বললেন তাপমাত্রার তারতম্যে এমনটা হয়েছে। হরিদ্বারে আবার একদিন থেকে আমরা হরিদ্বার থেকে জনশতাব্দী ধরে এলাম দিল্লী, সেখানে এশিয়াড ভিলেজে আমাদের অফিসের গেস্ট হাউস থেকে আনসেল প্লাজার ম্যাকডোনাল্ডসে লাঞ্চ সেরে বেলা চারটের ফ্লাইট ধরে সন্ধ্যে সাতটায় কলকাতা পৌঁছলাম।

কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ বা যখন গেছিলাম নিছক বেড়াতেই গেছিলাম, কিন্তু তীর্থপথের তাপ সইয়ে নিয়ে তীর্থদেবতারা যে ভাবে দর্শন দিয়েছেন, আজ ভাবতে বসলে মনে হয় নিশ্চয়ই তাঁরা অপার কৃপা করে ভালোবেসে সব বাঁধা সরিয়ে টেনেছিলেন, না হলে আমার মতো অকৃতি, অধম তাঁদের স্বর্গীয় দর্শন আর ঐশ্বরিক স্পর্শ পেলাম কি করে? তাই এই লেখা শুধু অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা বোধ আর তাঁদের করুণার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ব্রহ্মকপালী

ব্রহ্ম কাপালীতে পিণ্ডদান

মানাগ্রাম, মনোগ্রামের রাস্তায়, ব্যাসগুহা, সরস্বতী নদীর উৎস, মুখাকৃতি পাথর

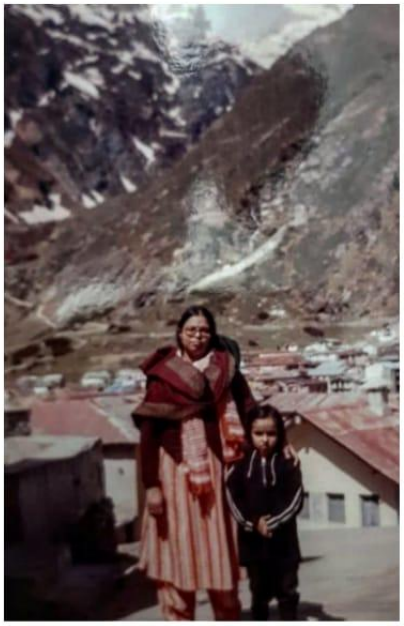
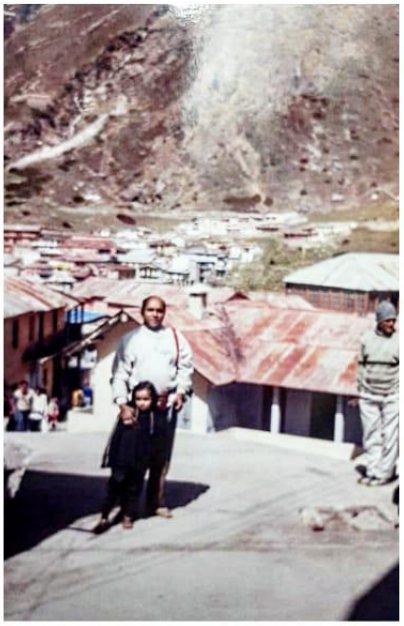

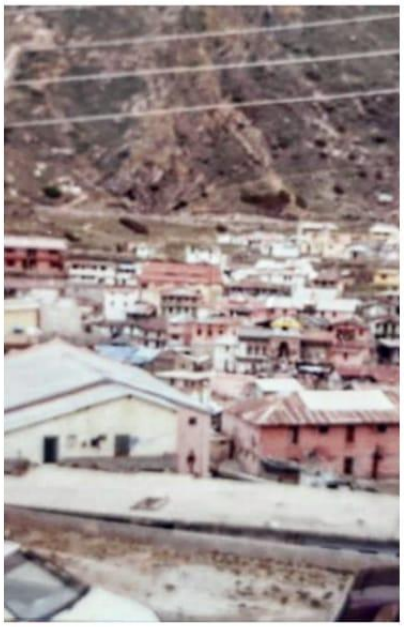
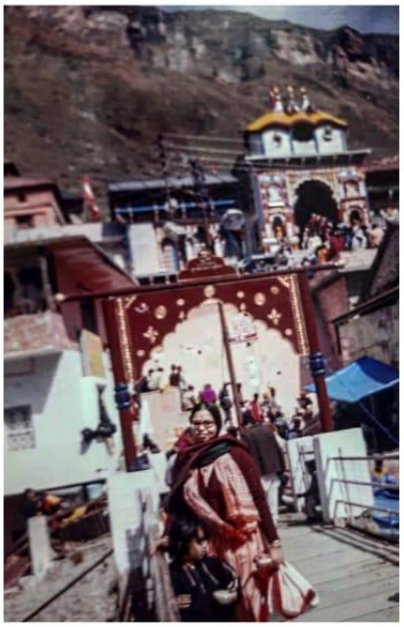

বদ্রীনারায়ানে
আমরা

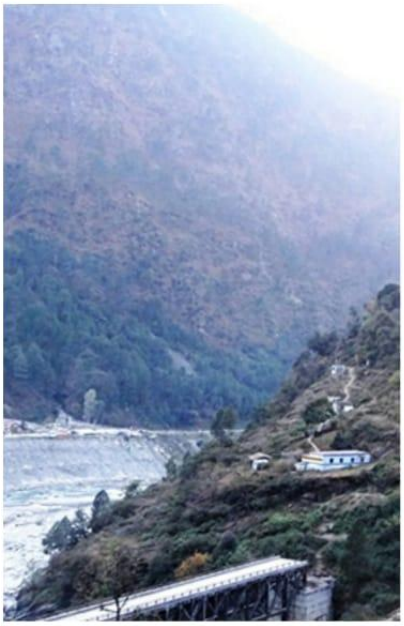

যোশীমঠ, আউলি, পিপলকটি

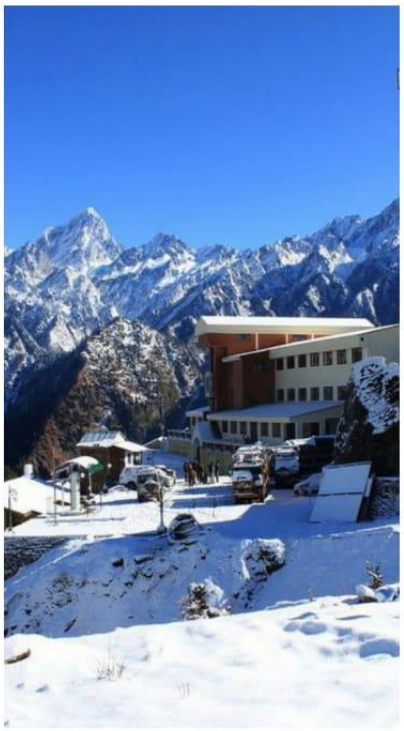

আউলি

যোশীমঠ

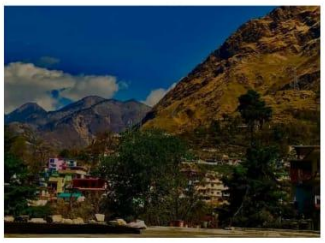

আউলি

পিপল কোটি

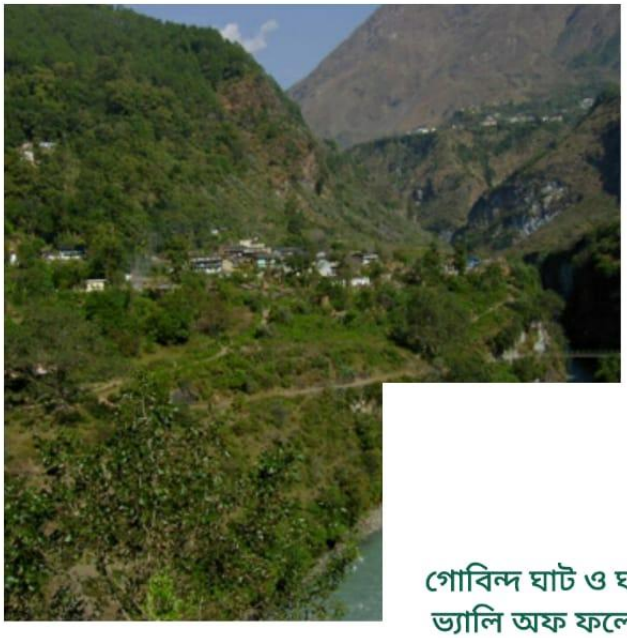

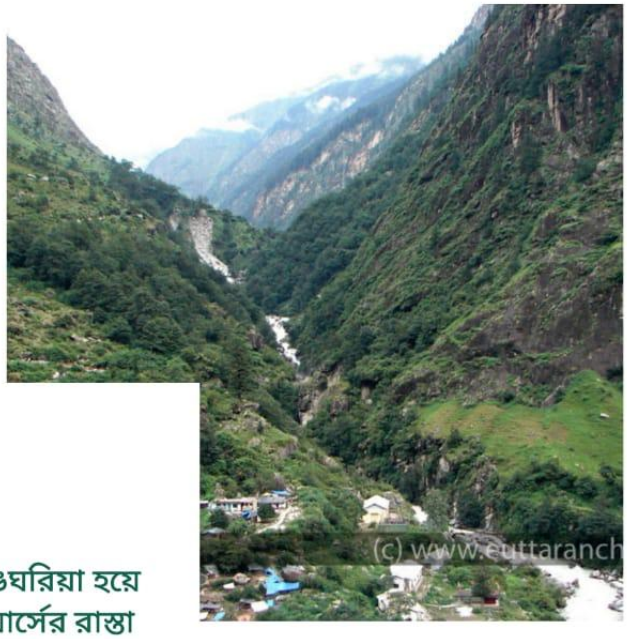

গোবিন্দ ঘাট ও ঘাঙঘরিয়া হয়ে
ভ্যালি অফ ফলোয়ার্সের রাস্তা

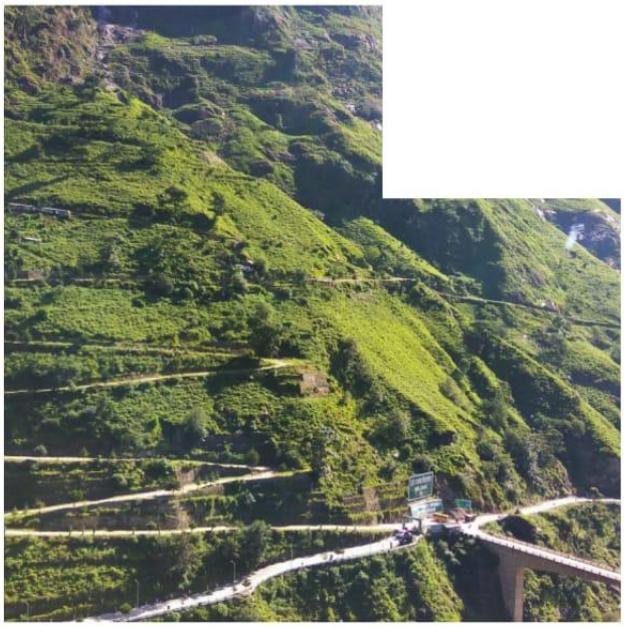

॥দেবদেউলের দেউলটি॥

দীর্ঘ চোদ্দ মাস ঘরবন্দী থেকে থেকে শেষে ঠিক হয়েছিল পয়লা জানুয়ারি নোদাখালি যাওয়া হবে ননদদের সঙ্গে, কিন্তু মেয়ের অনলাইন ক্লাসে ইউনিভার্সিটি থেকে বলে দিল যে পয়লা জানুয়ারি কোনো ছুটি নেই। তাই বুকিংটা হল না নোদাখালির রিসোর্টে। ননদেরা বুক করে নিল সেই রিসোর্ট। এটা হল চব্বিশে ডিসেম্বর, দুহাজার কুড়ি। অনলাইন ক্লাস একেই ভীষণ ক্লান্তিকর, তায় কোনো ছুটি নেই শুনে খুবই মন খারাপ হল মেয়ের। পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন মন খারাপ নিয়েই কাটল, ছাব্বিশ সাতাশ মন খারাপ ভুলতে বাড়িতে লেমন কেক বানালো, নানখাটাই বানালো, দারুণ খেতে হল সেগুলো। আঠাশ তারিখে ইউনিভার্সিটি বলল এক তারিখ মানে পয়লা জানুয়ারি ছুটি আছে। শুনে আরেক প্রস্ত মন খারাপ হল রিসোর্টে বুকিং সব ফুল হয়ে গেছে শুনে। ঊনত্রিশে বায়না জুড়লো বাবা মায়ের কাছে পয়লা জানুয়ারি কোথাও নিয়ে যেতেই হবে বেড়াতে। নিজে অনেকগুলো ওয়ান ডে ট্রিপ ডেস্টিনেশন খুঁজে বার করল ইউটিউবে, মা বাবার সঙ্গে শেয়ার করল। মা তো সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল কোনটা কতদূর, কিভাবে যাওয়া যায়, সবচেয়ে সস্তায় কিভাবে যাওয়া যায় ইত্যাদি, বাবার খুব মত নেই যাওয়ার ব্যাপারে যেহেতু পয়লা জানুয়ারি, কারণ সেদিন মোটামুটি সবাই বেরিয়ে পড়বে পিকনিক করতে, শেষে অনেক বলা হল বাবাকে। বাবা চলে গেল নিচের ঘরে, বুধবার তিরিশ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় বাবা বলল ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলেছে, সে একটু পরে জানাবে কত পড়বে। আসলে বাবার নিজেরই আজকাল ট্রেনে বাসে ট্যাক্সিতে টানাপোড়েন একদম পোষায় না, বয়স আর দীর্ঘ কর্মজীবনের অবসরে তিনিও চান একটু ধীরে সুস্থে নিজের মত করে যাতায়াতটা হোক, অন্তত ট্রেনের তাড়াটা থাকে না তাতে।

BANGLADARSHAN.COM

পরেরদিন ট্যাক্সি নিয়ে যাবেন যিনি সেই বাপিদা কন্ফার্ম করলেন যাওয়া। শুকনো খাবার, ব্যাগ ইত্যাদি সব গুছিয়ে ঠিক হল পরেরদিন আটটায় বেরোনো হবে, গন্তব্য রূপনারায়ণের তীরবর্তী দেউলটি। কলকাতা থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দেউলটির অবস্থান বাগনানের কাছে, খড়্গপুর যাওয়ার রাস্তায় দক্ষিণ পূর্ব রেলের একটি স্টেশন দেউলটি। পরেরদিন অর্থাৎ জানুয়ারি বেরোনো হল সকাল সাড়ে আটটায়, দ্বিতীয় হুগলী সেতু ধরে গাড়ি এগোলো, অন্তত তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা হাওড়া, আমতা, শিবপুরের, মৌরিগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তারপরে গাড়ি হাইওয়ে ধরল। কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে ছুটে চলল হু হু করে। প্রাথমিক ক্লান্তিকর জনপদের রোজের দিনযাপন ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ, ক্ষেত, বাড়িঘর ফেলে গাড়ি এগোতেই মন পাখিও তার দুডানা ছড়িয়ে উড়াল দিল প্রকৃতির কোলে। যিনি ট্যাক্সি চালাচ্ছিলেন সেই সারথি বাপিদা মা বাবার দীর্ঘদিনের পরিচিত। টুকটাক কথাবার্তা চললেও বাইরের অমসৃয়মান ছবিতে মনটা টেনে রেখেছে, তাই নৈঃশব্দ আস্তে আস্তে জায়গা করে নিল। আপন মনের চিন্তার লাগামকে রাশ আলগা করে এতদিন পরে বেরোনোর আনন্দে মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। দুবার টোল ট্যাক্সের জন্য দাঁড়াতে হল, প্রথমবার দ্বিতীয় হুগলী সেতুতে দশ টাকা

আর দ্বিতীয়বার কোনা এক্সপ্রেস ওয়েতে একশো পাঁচ টাকা করে দিতে হল, ক্রমে গাদিয়ারা, ফুলেশ্বর পেরিয়ে গাড়ি উলুবেড়িয়া ছাড়িয়ে ঢুকল দেউলটিতে।

এখানকার দর্শনীয় মূলতঃ তিনটি জায়গা, পানিত্রাস সামতাবেড়েতে কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ বারো বছর যে বাড়িতে কাটিয়েছেন সেই বাড়ি, রূপনারায়ণ ও তার তীর আর ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন মদনগোপাল জিউর টেরাকোটার মন্দির। সাড়ে দশটায় পৌঁছে গেলাম শরৎবাবুর বাড়িতে, সরকারি তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত এই বাড়িতে বসে শরৎবাবু লিখেছেন 'রামের সুমতি', 'অভাগির স্বর্গ', 'মহেশ' ইত্যাদি মর্মস্পর্শী লেখা। দেখলাম সেই লেখার ঘর, তাঁর ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, যেখানে বসে তিনি সৃজন করেছেন সেই সব চরিত্রদের, তিনি ময়ূর পুষতেন, তার ঘেরা জায়গাটা, সামনের সেই পুকুর যেখানে 'রামের সুমতি'র রামের কার্তিক গণেশ দুটি পোষা মাছ থাকতো। বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে পুজো চলছিল, এই কৃষ্ণ বিগ্রহটি শরৎবাবুকে দিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শরৎবাবুর লেখার ঘর থেকে দৃশ্যমান রূপনারায়ণ, শুনলাম তাঁর জীবদ্দশায় রূপনারায়ণ বাড়ির পাশ ঘেঁষে প্রবহমান ছিল, ওই লেখার ঘরে বসে তিনি রূপনারায়ণের শোভা দেখতে দেখতে লিখতেন, হয়তো অপলক চেয়ে থাকতেন নদীর বহতা স্রোতের দিকে। এখন সরে গেছে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। দোতলা বাড়ি, চারিদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগানে পেয়ারা, আম, বিভিন্ন ফুলের গাছ, শরৎবাবুর একটি মূর্তি আছে বাগানের ভেতরে। ওপরে দুটো, নিচে তিনটে করে ঘরে রাখা আছে আসবাব পত্র, খাট, বিছানা, ওঁর ছবি। ওপরের বারান্দার এক কোণে রয়েছে পাখির খাঁচায় কিছু পাখি, তাদের কলরবে মুখরিত ওপরের বারান্দা। বিরাট বারান্দায় দাঁড়ালে দৃশ্যমান দূরের বহতা রূপনারায়ণ তার স্বমহিমায়। বাগানে খেলে বেড়াচ্ছে কিছু হনুমান, বাগানের একধারে রাস্তার ধার ঘেঁষে রয়েছে শরৎবাবু, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী ও স্বামী বেদানন্দের সমাধি একটুকরো ঘেরা জায়গায়। আশ্চর্য শান্ত শীতল শ্যামলিমায় ঘেরা বাড়িটা, কিন্তু পয়লা জানুয়ারি বলে মানুষের হাঁকডাকে সেই নীরব শান্ততা টোল খাচ্ছে বার বার। ওখান থেকে বেরিয়ে ডাব খাওয়া হল, তারপরে হেঁটে হেঁটে চললাম রূপনারায়ণের পারে, সুন্দর সিমেন্টের বেঞ্চ করা আছে ধারে ধারে বসবার জন্য, সেখানে তাদের পসরা নিয়ে হাজির ফুচকা, এগ টোস্ট, চিকেন পকোড়া খাদ্যসামগ্রীর বিক্রেতারা। নৌকা নিয়ে ইতস্তত ঘুরছে মাঝিরা, লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে কাউকে নিয়ে নৌকা জলে ঘুরেও আসছে। কিন্তু একটু শান্তি নেই ওখানে, পিকনিক করতে আসা বোধহীন মানুষের চিৎকারে, ডি জে বক্সের ধুপ ধুপ আওয়াজে কাল ঝালাপালা করে মাথা ধরে গেল, তাও আওয়াজ এড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে একটু বসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেদিকেও অচিরেই আওয়াজ শুরু হয়ে গেল, তার সঙ্গে চলল পিকনিক পার্টির ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে নাচ, গান, আবার কেউ কেউ জামা খুলে দেহ প্রদর্শনে রত দেখা গেল। এই উদ্দামতা, অশালীন সংস্কৃতিই এখন বাঙালির চরিত্র হয়ে গেছে। সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কোনোরকমে বসে থেকে উঠে চলে এলাম, বলা ভালো পালিয়ে এলাম। চললাম মদনগোপাল মন্দির দর্শনে, স্থানীয় মানুষেরা খুবই আন্তরিক, তাঁরা পথ নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সেই মত গিয়ে বাঁধের ধারে গাড়ি রেখে মিনিট কুড়ি হেঁটে পৌঁছলাম মদন গোপালের মন্দিরে। জমিদার মুকুন্দপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ষোড়শ শতাব্দীর টেরাকোটার এই মন্দির এককথায় অসাধারণ, আমাদের বাংলায় এমন কত শত শিল্পকর্ম পড়ে আছে ছড়িয়ে, আমরা

BANGLADARSHAN.COM

কতটুকুই বা তার খোঁজ রাখি!!! কিন্তু বিধি বাম, মদন গোপাল দর্শন দিলেন না, মন্দির বন্ধ, পুরোহিত মশাইয়ের পয়লা জানুয়ারি নিমন্ত্রণ আছে, তাই তিনি এগারোটায় মন্দির বন্ধ করে চলে গেছেন, মন্দিরের চারদিকে, তার চাতালে দাঁড়িয়ে অনেক ছবি তোলা হল দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে। এই দেবদেউলের জন্যই জায়গাটির নাম দেউলটি। গ্রাম বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল রূপটি ছড়িয়ে আছে দেউলটিতে, দু পা হাঁটলেই গাছে ঘেরা পুকুর, বাঁশবাগান, আম, জাম, বেলগাছ, মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে ফুলের চাষ দেখলেই মনে পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাদেশ কবিতার সেই লাইন গুলো, "কোন দেশেতে তরুলতা, সকল দেশের চাইতে শ্যামল", একেবারে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রামের রূপ।

সেখান থেকে বেরিয়ে একটু নিরিবিলি নদীর ধারে বসার জায়গার খোঁজ করতে একজন স্থানীয় লোক বললেন ওলফুলি যেতে, সেখানে নদীর ধারে নির্জনতা আছে। নির্জনতা ছাড়া প্রকৃতির নিজস্ব সুরটা ব্যাহত হয়, আমাদের পরিবারের আমরা সকলেই নির্জনতা ভালোবাসি, নির্জন নিস্তব্ধ প্রকৃতি অন্তরাত্মাকে উজ্জীবিত করে নিজের অন্তরের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগকে অনুভব করতে। এবারে রেললাইন আর লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে উত্তর দিকে বেশ কিছুটা যেয়ে পাওয়া গেল নির্জন নদীর ধার ওলফুলিকে। সোনার বাংলার হোটেল সেখানে নির্মীয়মান, সত্যি একদম নির্জন জায়গাটা। রাস্তা থেকে সরু আল ধরে নেমে গিয়ে উলুখাগড়ার বনের ধারে ঢুকে এসেছে এক টুকরো খাঁড়ি, নৌকোয় বার্নিশ করে শুকোচ্ছে নদীর ধারে মাঝি, কিছু নৌকা দাঁড় করানো আছে খাঁড়ির ভেতরে, সময়টা যেহেতু দুপুর তাই যে দুয়েকজন মাঝি আছেন, তাঁরা চান করার তোড়জোড় করছেন। এখানে বহমান গঙ্গা। আমাদের সারথি ভদ্রলোক বাপিদাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া খাবার দিয়ে আমরা চললাম নদীর ধারে, বাপিদাকেও অনুরোধ করেছিলাম, উনি গাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা ওখানে বসে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শুকনো খাবার আর ফলের সৎগতি করলাম। আমাদের সকালের প্রাতঃরাশ যেহেতু ফল দিয়েই সমাধা হয়, তাই আমরা ওতেই খুব স্বচ্ছন্দ। কেউই খুব ভোজনপটু নই আমরা, তাই ভালোই হল এই কাগজ পেতে পিকনিক। তারপরে চললাম সেই খাগড়াবন পেরিয়ে নদীর পাড়ে, বক উড়ছে জোড়ায় জোড়ায়, নদীর বুকে একটা টাওয়ার রয়েছে দেখলাম থার্মাল পাওয়ারের, কাছেই কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট। নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ তুলে ছুঁয়ে যাচ্ছে পাড়ের কোল ঘেঁষে। একদম নির্জন, নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে সোনার বাংলা হোটেলের কনস্ট্রাকশনের আওয়াজ আসছে কানে। অপূর্ব শোভা, ঝকঝকে রোদ্দুরের প্রতিফলন জলের মধ্যে বড়ো মনমুগ্ধকর, উড়ে বেড়াচ্ছে কত পাখি ফিঙে, দোয়েল, বক, মাছরাঙা, জলে সাঁতার দিচ্ছে পানকৌড়ি দম্পতি, বেশ কিছুদূরে দৃষ্টি গোচর নদীর বাঁক। বিশাল বিস্তারে বয়ে চলেছে গঙ্গা, ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে বেরিয়ে তার যাত্রা পথে এখান দিয়ে বয়ে গিয়ে মিশেছে গঙ্গার মূলধারায়। চুপচাপ বসে সেই অনন্ত জলের স্রোত দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমাদের জীবনের স্রোত এমনই মেশে মহাজীবনের স্রোতে, আত্মা মেশে পরমাত্মায়। তিনটে নাগাদ উঠে পড়লাম, রোদ্দুরে বেশ গরম লাগছে বলে, এসে গাড়িতে উঠে একটু এগিয়ে এসে মিষ্টি কেনা হল, জল কেনা হল। আবার দুধারের প্রকৃতি

দেখতে দেখতে ফিরে আসা আপন নীড়ে, বাড়িতে ঢুকে গেলাম সাড়ে পাঁচটায়। বহুদিন পরে দুবাহু বাড়িয়ে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করে এসে মন এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতায় ভরে উঠল।

রূপনারায়ণের বুকে নৌকা

ক্ষেত

খাঁড়ি

তুলসী গাছের ঘর
পুকুর ঘাট

বাড়িসংলগ্নবাগান
গাছেঘেরাপুকুর

রূপনারায়ণ

ময়ূর রাখার ঘর,
পেছনের ঘর, উঠোন

মদনগোপাল মন্দির
Directorate of Archaeology & Museums
Information & Cultural Affairs Department
Government of West Bengal
মন্দিরের রাস্তায়

শরৎবাবুর লেখার ঘর
আর নীচের শয়ন কক্ষ

দোতলার বারান্দা
দোতলার শোবার ঘর
পাখির খাঁচা
নীচের বাগানে সমাধি

॥জয়দেবের মেলা॥

কেন্দুলির জয়দেবের মেলা

****

শীতের কুয়াশা মাখা ভোরে কম্বলের উষ্ণতা ছাড়তে একটুও ইচ্ছে করছে না, এদিকে অজয়ের চরে সংক্রান্তির স্নানের সময় ভোর পাঁচটা সাঁইতিরিশ মিনিট থেকে আরো চল্লিশ মিনিট। কথিত আছে ওই সময় নাকি মা গঙ্গা স্বয়ং আসেন অজয়ের স্রোতে আর সেই পুণ্যস্রোতে স্নান করে পুণ্যকামী মানুষ নিজেদের ধন্য মনে করে। উঠতে হবেই, দোনামোনা করছি, দূর থেকে দেখি ভেসে আসছে কোন অজানা বাউলের গান,

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
এক পড়শী বসত করে।"

প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে এই সময়টায় আর এই সময়েরই হল অজয়ের চরে জয়দেবের মেলা। কালকে সংক্রান্তির আগের দিন এসে পৌঁছেছি দুর্গাপুর থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় আমরা চার বন্ধু, আমি, কাঞ্চন, সুস্মিতা আর সুমন। মেলা তখনি বেশ জমে উঠেছে। বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেবের আবাসভূমি কেঁদুলিতে কেন্দ্র করে এই মেলাতে মূলতঃ কীর্তনিয়া আর বাউল সমাবেশ ঘটে প্রতি বছরে। মেলায় ঢুকতে ঢুকতে শুনেছি লোচনদাস বাবাজীর আখড়ার চলছে রজত কীর্তনিয়ার গলায় গোবিন্দদাসজীর পদাবলী কীর্তন,

BANGLADARSHAN.COM

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গহিলোলে
মদন মূরছা পায়॥
সে শ্যামনাগরে কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন না সদাই ঝুরে॥

উঠে পড়তে হল, রামপুর ফুটবল মাঠের ধারে জনৈক অম্বিকা পালবাবু কালকে রাত্রে নিরুপায় আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর বাড়ির বাইরের বৈঠকখানা লাগোয়া দুটি ঘরে, একটাতে আমি আর সুস্মিতা আর একটাতে কাঞ্চন আর সুমন। আবেগের বসে চলে এসে কোথাও যখন আশ্রয় পাচ্ছিলাম না তখন উনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন আমাদের রাত দশটায়। অনেকটা হেঁটে গিয়ে ঘাটে স্নান করে যখন ফিরছি আমরা, কুয়াশা সরে গিয়ে সূর্যোদয় হচ্ছে। এসে ব্যাগপত্তর ওখানে রেখে চললাম মেলা প্রাঙ্গনে। একটু এগোতেই এসে

পড়লাম রাধাবিনোদ মন্দিরের সামনে। খিচুড়িভোগ দিচ্ছে এখানে, এই খিচুড়িভোগের একটা লোকগাথা শুনলাম, প্রতিবছর মেলা শেষ হলে সংক্রান্তির পরেরদিন একটা বড়ো কড়াইতে খিচুড়ির চাল-ডাল-মশলা দিয়ে ঢাকা দিয়ে বসিয়ে দেয় ওরা মুখটা ঢেকে মাটিচাপা দিয়ে, সারাবছর ঐভাবে থাকে আর ঠিক এই আজকের দিনে মানে সংক্রান্তির দিনে সেই কড়াই যখন তোলে, খিচুড়ি তৈরী হয়ে যায়, এবং সেইদিন যত লোক আসে সবায়ের কপালেই নাকি জুটে যায়। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার লাগলো শুনে। আমরা খিচুড়ি নিলাম, কি অপূর্ব স্বাদ!!! ভক্তি বিশ্বাসের দিকটা যদি ছেড়েও দিই, এতোগুলো মানুষের প্রসাদের সংস্থান হয় এর থেকে সেই বা কম কথা কি!!! এগিয়ে চললাম আমরা, বিভিন্ন বাউলের আখড়াতে বাউলেরা বিভোর হয়ে গাইছেন, কেউ বা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, হাতে একতারা বা দোতারা বাজিয়ে, বেশিরভাগই প্রান্তিক মানুষজন, অনেককে দেখেই বোঝা যাচ্ছে নেশাখোর, কিন্তু সকলেরই সমর্পিত চিত্ত। আলাপ হল বিক্রমবাউল আর তার সঙ্গিনী পার্বতীর সঙ্গে, সুদূর নদীয়া থেকে এসেছেন এঁরা, গান শোনালেন সামনে বসিয়ে, “ধর লও ধর লও, লও হে কিশোরী প্রেম” শুনতে শুনতে এক অনাবিল ভালোলাগায় মন ভরে যাচ্ছিল।

মেলা প্রাঙ্গনে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম পবন কীর্তনীয়ার অস্থায়ী আখড়াতে, রুবি কীর্তনীয়া কপালে রসকলি টেনে গাইছেন,

“মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়॥”

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত কীর্তনের মধ্যে তাঁর অন্তরের আকুতিটি ফুটে উঠছে যেন। আরেকটু এগোতে দেখলাম কবিগানের আখড়াতে চলছে কবির লড়াই। সবাই ভীড় করে দেখছে।

এই মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে পণ্য সামগ্রী নিয়ে দোকানদাররা মেলায় দোকান করার উদ্দেশ্যে আসেন। অনেকে মেলায় বিক্রি করার জন্য সারা বছর পণ্য তৈরি করে সঞ্চয় করে রাখেন। শুধু ব্যবসায়ীগণই নয়, উৎপাদক, চাষীরাও বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় বিক্রি করার জন্য হাজির হয়।

মেলায় কোথাও মাটির জিনিস, কোথাও কাঠের জিনিস, কোথাও ঘুড়ি আবার কোথাও খাবারের দোকান বসে। মেলার বিশেষ একটি অংশজুড়ে নানা ধরণের কৃষিদ্রব্যের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এই মেলায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব ধরণের মানুষের সমাগম ঘটে। এসব মানুষের জন্য নানা রকমের খাবারের আয়োজন করা হয়। নানা রকম মিষ্টি খাদ্য প্রিয় মানুষদের কাছে লোভনীয় ব্যাপার হয়ে ওঠে। ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা রকম খেলনা, মাটির, কাঠের বা প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন রকম পণ্য সামগ্রী মেলায় আসে। এসব উপকরণের বৈচিত্র্যের শেষ নেই। প্রকৃতপক্ষে মেলাকে শিশুদের আনন্দের জগৎ বললেও ভুল হবে না। তাদের মুখে বাঁশির শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে।

ভক্তিকবি জয়দেব আর পদ্মাবতীর জন্য বিখ্যাত কেন্দুলি, কবি জয়দেবের সাধনায় স্বয়ং বিনোদবিহারী তাঁর শ্রীরাধিকাকে সাথে নিয়ে জয়দেবকে আশীর্বাদ করে গেছেন, মন্দিরের কাছে রাধাবিনোদের সঙ্গে জয়দেব আর পদ্মাবতীর মূর্তি। মন্দিরের অপূর্ব টেরাকোটার কাজ আমাদের বাংলার ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করেছে।

হঠাৎ দেখি মেলার একদিকে সেই পুরোনো কাঠের বাক্সের মতো নাগরদোলায় ওঠা এক প্রায় বৃদ্ধ দম্পতি ভদ্রলোকের ওই মাঝখানের ফাঁক দিয়ে দুটো পা ঝুলছে আর ভদ্রমহিলা পরিত্রাহি চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছেন। ধুতি পরা ভদ্রলোককে যখন নামালো দেখা গেল তাঁর ধুতির একটা দিক আর পরবার অবস্থায় নেই। সবাই হাসছে দেখে। আরেকটু এগোতে চোখে পড়ল বড়ো সাইনবোর্ডে "রবিবাউলের আখড়া", সেখানে কবিগুরুর সব বাউলাঙ্গের গান একতারাতে গাইছেন দুতিনজন অখ্যাত গায়ক, কিন্তু বেশ সুরে গাইছেন এবং যথাযত গায়কী মেনেই গাইছেন। মনে হল সত্যি তো রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বজনীন বাউলই বটে। মেলা চলবে দোসরা মাঘ পর্যন্ত, আমরা আজি ফিরব। বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাবার সময় দেখি জীর্ণ পোশাকের এক বাউল গাইছেন, "শুনেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা", তাঁর হাতে কিছু টাকা দিতে ভারী খুশি হয়ে বললেন, "চললেন আপনারা এত শিগগির? বাউল, কীর্তনিয়া আর সাধারণ মানুষের এই মিলনক্ষেত্র আর কোথাও পাবেন না বাবারা, মা জননীরা। আমি প্রতিবছর আসি শুধু মানুষের মহামিলন দেখতে, আপনাদেরও বলছি আপনারাও আসবেন আবার।" তাঁর কথায় কেন জানি চোখ দুটো জ্বালা জল এলো, মানুষের মহামিলনস্থল ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলেই কি? আমরা বাসে উঠে বসলাম ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে। দুর্গাপুর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার কেন্দুলি যেখানে বসে জয়দেবের মেলা।

BANGLADARSHAN.COM

রাধাবিনোদজীর মন্দিরের
টেরাকোটার কাজ

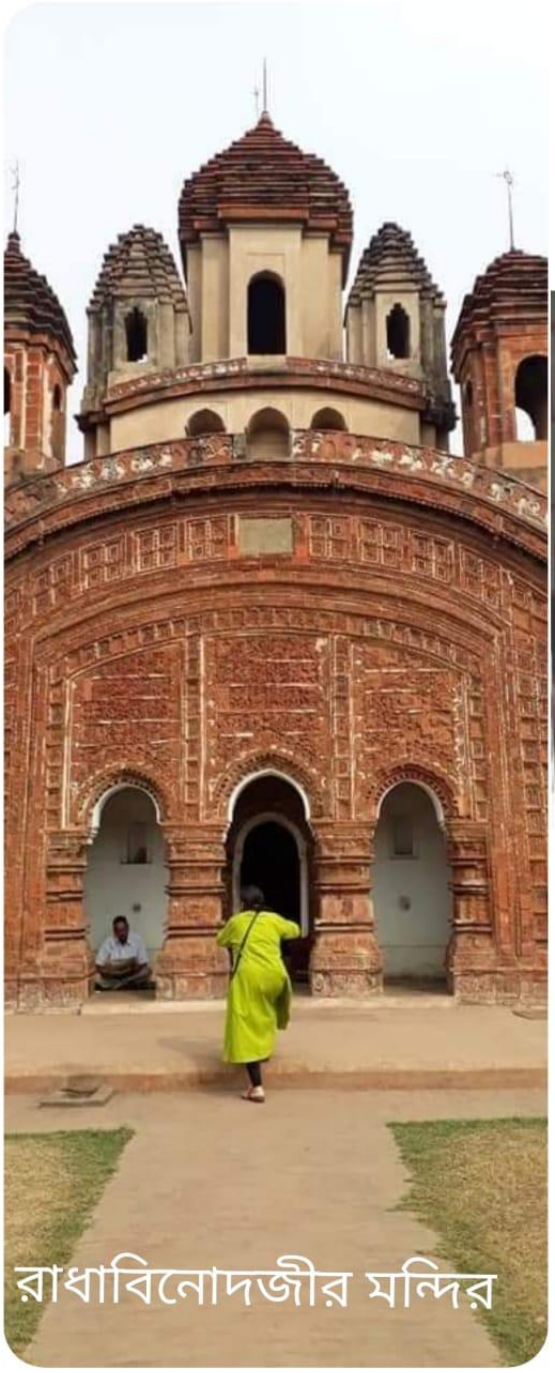

রাধাবিনোদজীর মন্দির

রাধাবিনোদজীর দুপাশে কবি জয়দেব ও পদ্মাবতীর বিগ্রহ

অজয় নদ

অজয়ের স্রোত

অজয় নদের চর

॥ওঁম মণিপদ্মে হুম॥

মহাকবি জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্রের নবম পংক্তিতে বুদ্ধবতারের উল্লেখ এই ভাবে হয়েছে:

“প্রলয় পয়োধি-জলে ধৃতবান্ অসি বেদম্
বিহিত বহিত্র-চরিত্রম্ অখেদম্
কেশব ধৃত-মীন-শরীর, জয় জগদীশ হরে।

নংদসি যজ্ঞ-বিধের্ অহঃ শ্রুতি জাতম্
সদয-হৃদয়-দর্শিত-পশু-ঘাতম্
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর জয় জগদীশ হরে।”

–কবি জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র

বৈষ্ণব পুরাণ বলে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব হলেন বিষ্ণুর নবম অবতার। অহিংসা ও প্রেমের বাণী নিয়ে অষ্টাঙ্গ মাগের নীতি অনুসারী সিদ্ধার্থ গৌতমের প্রচারিত যে বৌদ্ধধর্ম, তার সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশগুলিতে বিদ্যমান আর বৌদ্ধধর্ম আর তিব্বতী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে নিজেদের গড়ে তুলেছে সিকিম ও ভুটান। কথিত আছে, আদি শঙ্করাচার্য যখন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আসমুদ্রহিমাচল তর্কযুদ্ধে ও শাস্ত্রবিচারে অন্য ধর্মের মতাবলম্বী পন্ডিতদের হারাতে হারাতে নেপাল ছাড়িয়ে তিব্বতে (তৎকালীন মহাচীন) উপস্থিত হন এবং সেখানকার বৌদ্ধ পন্ডিতদেরও পরাস্ত করেন এবং পরের দিন ধার্য হয় তাঁদের বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের, তখন সেখানকার সেই বজ্রযোগিনী তারার উপাসক পন্ডিতেরা বজ্রযোগিনী মা তারার কাছে আকুল আবেদন করেন যাতে তাঁদের মায়ের উপাসনা ও বৌদ্ধ ধর্ম না ত্যাগ করতে হয়, তাঁরা প্রার্থনা জানান মায়ের কাছে তাঁদের স্বধর্ম রক্ষার। যার ফলশ্রুতি মা তারা রাত্রের দ্বিপ্রহরে আবির্ভূত হয়ে আদি শঙ্করাচার্যকে ভর্ৎসনা করেন এবং সেই রাত্রের মধ্যে ঐ স্থান পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়ে বলেন যে মায়ের যে সন্তান মাকে যে রূপে ও উপায়ে চাইবে আরাধনা করবে, আদি শঙ্করকে মা সেই অধিকার দেননি তিনি সকলকে নিজ মত গ্রহণে বাধ্য করেন। শোনা যায়, তারামায়ের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে আদি শঙ্করাচার্য মাকে শান্ত করতে “ভবান্যাষ্টকাম” স্তোত্রটি রচনা করে মায়ের স্তব করে মাকে শান্ত করেন, এবং মায়ের আদেশপ্রাপ্ত আদি শঙ্করাচার্য মায়ের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সেই রাত্রে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন আর তিব্বত ও তার পার্শ্ববর্তী চীন (যা সেই সময়ে মহাচীন নামে খ্যাত ছিল) ও অন্য উত্তর পূর্বের বেশ কিছু জায়গায় বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্যমান থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

সময়টা ২০০২ এর মে-জুন মাস, মেয়ে তখন চার বছরের, জ্যৈষ্ঠের গরমে খুবই কষ্ট চলছে, তার মধ্যে আমাদের গ্যাংটক বেড়াতে যাওয়া ঠিক হল। সেই মতো ব্যাগ গুছিয়ে মেয়েকে নিয়ে আমরা চড়ে বসলাম কামরুম এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ল বেলা দুটো নাগাদ, কিন্তু দেখা গেল আমাদের একটা টিকিট ওয়েটিং লিস্ট

হয়েছিল, সেটা RAC হল, কিন্তু মেয়ের বাবাকে টাকার বিনিময়েও মালদার পরে শুতে দেবেন না টিটি ভদ্রলোক বলে দিলেন। মালদা পেরোনোর পরে দেখা গেল যে ট্রেনে বেশ কিছু বার্থ খালি যাচ্ছে আর সেই টিটি ভদ্রলোক একটা বার্থে শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন নাক ডাকিয়ে, আমাদের আর ঘুম হল না, গাড়ি আর ছোট ছোট বাস দাঁড়িয়ে লোকজন ডাকছে, আমরা একটা গাড়ি নিলাম সোজা গ্যাংটকে নামাবে আমাদের হোটেলে।

শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের দূরত্ব ১২৫ কিমি, পাহাড়ী রাস্তা, চার সাড়ে চার ঘণ্টা লাগে পৌঁছতে, পথে আমরা সেবক ব্রিজ পেরোলাম কিন্তু সুন্দরী তিস্তা চললো আমাদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ।

পাকদন্ডী রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠেছে, তিস্তার পাড় আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘন গাছের জঙ্গল, মাঝে মাঝে কিছু কিছু চা বাগানও চোখে পড়ে, আকাশে ঘন মেঘের ঘনঘটা, যেতে যেতে হালকা বৃষ্টি শুরু হল, আমরা ঘণ্টা খানেক চলে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে হালকা ব্রেকফাস্ট করলাম, এবার গাড়ি ছাড়ার পরে একটু ঠান্ডা লাগতে আস্তে আস্তে গরম জামা বেরোলো, মেয়ে দিব্বি ঢাকাঢুকি দিয়ে আমার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর আমি মুগ্ধ চোখে হিমালয়ের ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে আঁকা বাঁকা পথে গাড়ির এগিয়ে চলা, একপাশে অতলস্পর্শী খাদের শেষে রূপালি ফিতের মতো কোনো জলধারা আর একপাশে ঘন সবুজ ফার্ন, অর্কিড আর বুনো গাছে আবৃত পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য, রাস্তার মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্ণার স্রোত, কোনো বাঁকের পরে খোলা প্রকৃতিতে সবুজ গাছ আর বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাথায় মেঘের ঘোরাফেরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম।

BANGLADARSHAN.COM

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা॥
বাজে অসীম নভো মাঝে অনাদি বর,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা॥
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে পরম–
এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।
বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্ত চিত বাক্যহারা॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সারথী সঞ্জয় স্থানীয় ছেলে, বছর কুড়ি বয়স হবে তার, তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল আমাদের। প্রায় এগারোটার সময়ে আমরা পৌঁছলাম গ্যাংটক, আমরা যে হোটেলে বুকিং করেছি, হোটেল হিমালয়ান লিসার ইন, সেটা পালজোর স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে গ্যাংটকের কোর্টের কাছে। এই পালজোর স্টেডিয়ামেতেই তখন ফুটবলের প্রশিক্ষণ দিতেন বিখ্যাত ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া যিনি নিজেও জন্মসূত্রে সিকিমের লোক। সেই হোটেলে পৌঁছে গেলাম। আমাদের ঘরের জানলা খুললে সামনে অনেকগুলো শৃঙ্গ চোখে পড়ে, কিন্তু মেঘে

ঢাকা থাকায় বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। সেখানে দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে একটা অটো ধরে এলাম এম জি রোডে আমাদের ট্রাভেল এজেন্টের সাথে কথা বলতে। পরেরদিন আমাদের পেলিং য়ুমথাং যাবার কথা ছিল কিন্তু ওই রাস্তায় ধস নামায় ঠিক হল আমরা আগে গ্যাংটকের আশে পাশের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নেব। ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে, এম জি মার্গ ঘুরে আমরা হোটেলে ফিরলাম। আমাদের ঘর দোতলাতে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে দেখি ওপরে পাহাড়ে ছোট ছোট আলো জ্বলছে আর ঘণ্টা বাজছে, শুনলাম ওপরে একটা বৌদ্ধ গুমফা রয়েছে। আমাদের ডাইনিং হল চারতলার ওপরে যাব একদিকে খোলা ছাদ আর একদিকে কাঁচ দিয়ে ঢাকা ডাইনিং হল, ডাইনিং হল থেকে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম।

চোখধাঁধানো তুষারশৃঙ্গ, নজরকাড়া নদী ও ঝর্ণা, মনোমুগ্ধকর সরোবর, গভীর অরণ্য, নানারকমের পাখি ও জন্তু-জানোয়ার, দৃষ্টিনন্দন অর্কিড-ক্যাকটাস-ফুল, ঐতিহ্যমণ্ডিত গুম্ফা ও মন্দির—এই সবকিছুর সমাহার হল সিকিম রাজ্যের রাজধানী শহর হল গ্যাংটক। গোটা শহরটি যেন পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। ৫৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই শহরে শপিং মল, ক্যাসিনো, সিনেমা হল, ভিডিও পার্লার, সাইবার কাফে, কিউরিও শপ, জামাকাপড় ও ইলেকট্রনিক্সের দোকান ইত্যাদি আধুনিক শহরের সব উপাদানই পাওয়া যায়। শহরের প্রাণকেন্দ্রে আছে এম জি মার্গ (মহাত্মা গাঁধী মার্গ)। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সেরে নেওয়া যায় প্রয়োজনীয় কেনাকাটা। দূরের আকাশে উপস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা হয়তো তখন দ্যুতি ছড়াচ্ছে। রোপওয়ে চড়ে আকাশপথেও দেখে নেওয়া যায় গ্যাংটক ও চারপাশের দৃশ্য।

BANGLADARSHAN.COM

গ্যাংটক শহর ও তার আশপাশের দ্রষ্টব্য এতই বেশি যে সাইটসিয়িং করতে অন্ততপক্ষে দুটো দিন সময় লাগবেই। রুমটেক মনাস্ট্রি, রাঙ্কা মনাস্ট্রি, এন্‌চে মনাস্ট্রি, চোগিয়াল রাজবাড়ি, ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজি, ডিয়ার পার্ক, বন্‌ঝাকরি ঝর্ণা, ফ্যামবং-লো অভয়ারণ্য, হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক, তাশি ভিউ পয়েন্ট, হনুমান টক ইত্যাদি প্রচুর দর্শনীয় স্থান দেখে নেওয়া যায় হাতে সময় নিয়ে।

গ্যাংটক বেড়াতে আসা প্রায় সব পর্যটকই যে পথে পা বাড়ান, তা হল ছাঙ্গু লেক, নাথুলা ও বাবামন্দির। আগাম অনুমতি নিয়েই যাওয়া যায় এ পথে। চড়াই রাস্তা ধরে গাড়ি পৌঁছে যাবে ৩৮ কিলোমিটার দূরবর্তী ছাঙ্গু লেকে। উচ্চতা ১২৪০০ ফুট। নীলরঙা জলের সুন্দর সরোবরে ভেসে বেড়ায় পরিযায়ী পাখির দল। এখান থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরেই চিন সীমান্ত নাথুলা। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে দেখা যায় চিনের ঘরবাড়ি, টহলদারি চিনা সৈনিক। ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই নাথুলা দিয়েই বর্তমানে ভারত-চিন বাণিজ্য চলে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে। ফেরার পথে, নাথুলা গেট থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাবামন্দির দর্শন করে নিতে পারেন। দুর্ঘটনায় অকালমৃত ভারতীয় সেনানী বাবা হরভজন সিংয়ের স্মৃতিমন্দির এটি। বাবামন্দির দেখে আবার ফিরে আসতে হবে গ্যাংটকেই। আমার মেয়ের যেহেতু তখনো পাঁচ বছর হয়নি, তাই নাথুলা পাস্ আর বাবা মন্দির আমাদের যাওয়া হল না। আমরা ছাঙ্গু গেলাম এক বৃষ্টিঝরা সকালে। ট্রেকারে অনেকের সাথে চলেছি আমরা, বিপদসংকুল পাহাড়ী পথ, কোথাও কোথাও রাস্তা খুবই সংকীর্ণ, তায় পাহাড়ী ঝর্ণা বয়ে গেছে ঐটুকু পথের ওপর দিয়ে, ট্রেকার চলেছে সেই জায়গাগুলোতে খুবই আস্তে আস্তে।

পথে পড়ে kyongnosla ওয়াটার ফলস, সেখানে যখন পৌঁছলাম অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে, তবু নামলাম, জল ছুঁয়ে আবার চলা, শুরু হল বর্ডার রোড অর্গানজেশন আর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সেনাবাহিনীর এলাকা, গাড়ি দাঁড়ালো চেক পোস্টে, পার্মিট দেখে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিলেন সৈনিকটি। ঘুরে ঘুরে রাস্তা উঠেছে, তারই মাঝখানে সেনা বাহিনীর ক্যাম্প, পেট্রল পাম্প, কোয়ার্টার, তাদের মেস, তার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলা, আকাশ অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করে চলেছে, চারিদিক বৃষ্টিতে ধূসর বর্ণ, একটা ভীষণ মনখারাপ করা আবহ। কিন্তু ছাঙ্গুতে পৌঁছলাম যখন মন ভালো হয়ে গেল বরফে ঢাকা লেক, বরফাবৃত পাহাড়, উপত্যকা আর নীল জলরাশির লেকটি দেখে, তার জলে বিরাট দুটি খন্ড বরফ ভেসে রয়েছে।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে (পূজা)

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া-মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

BANGLADARSHAN.COM

নয়নদুটি মেলিলে কবে
পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে
জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওখানে একটি দোকানে সিকিমিজ পোশাক ভাড়া করে ছবি তোলা হল, মেয়ের বাবা মেয়েকে আমার হেফাজতে রেখে একটু ট্রেকিং করে ওপরে গেল, এদিকে মেয়ে তাই দেখে বায়না ধরলে মেয়ের বাবা তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে আরেকটু হলেই পড়েছিল আর কি ওই লেকের জলে। কিছুক্ষণ থেকে ওখানে আমরা আবার ফেরার জন্য ট্রেকারে উঠে বসলাম, কিছুটা রাস্তা আবারও বৃষ্টি পেলাম, কিন্তু তারপর বেশ ভালো আবহাওয়া। ফিরে এসে সেই এম জি মার্গে নেমে আবার অটো ধরে হোটেলে। ঘরে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে

চেয়ে দেখি রোদ উঠেছে আর তারই আলোয় অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন সোনার মুকুটে সেজে দর্শন দিচ্ছে, মন এক অনাবিল আনন্দে ভরে গেল।

গ্যাংটক ভারতীয় রাজ্য সিকিমের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। পূর্ব হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শিবালিক পর্বতে ১৪৩৭ মিটার উচ্চতায় গ্যাংটক শহরটি অবস্থিত। শহরের জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। এই শহরের বাসিন্দারা প্রধানত নেপালি, লেপচা ও ভুটিয়া। সিকিম সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এই শহরের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। হিমালয় পর্বতমালার সুউচ্চ শিখরগুলির মাঝখানে মনোরম পরিবেশে গ্যাংটকের অবস্থান। এই অঞ্চলের জলবায়ু সারা বছরই মোটামুটি আরামদায়ক। এই কারণে গ্যাংটক সিকিমের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র।

১৮৪০ সালে এনচে মঠ নির্মাণের পর থেকেই বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে গ্যাংটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৪ সালে তৎকালীন সিকিম চোগিয়াল (রাজা) থুতোব নামগিয়াল গ্যাংটকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিব্বতের লাসা ও ব্রিটিশ ভারতের কলকাতার মধ্যে বাণিজ্য পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্রামস্থলে পরিণত হয় গ্যাংটক। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর সিকিম ভারতে যোগ না দিয়ে স্বাধীন রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসত্ত্বা বেছে নেয়। এই সময় গ্যাংটক ছিল দেশটির রাজধানী। ১৯৭৫ সালে সিকিম ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যোগ দিলে গ্যাংটক ভারতের বাইশতম রাজধানীতে পরিণত হয়।

গ্যাংটক নামটির সঠিক অর্থ জানা যায় না। যদিও নামটির জনপ্রিয়তম অর্থ হল পাহাড় চূড়া। বর্তমানে গ্যাংটক তিব্বতি বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার একটি কেন্দ্র। এখানে একাধিক বৌদ্ধ মঠ, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তিব্বততত্ত্ব কেন্দ্র রয়েছে। তিব্বতী সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন দেখা যায় সিকিমে। একদা সিল্ক রুটের অন্তর্গত এই সিকিম সীমান্ত দিয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসা ও লাসা হয়ে কৈলাস মানস সরোবর যেতেন তীর্থযাত্রীরা। ১৯১২ সালে এই রাস্তা বন্ধ হয়।

BANGLADARSHAN.COM

১৯৪৩ সালে তৈরী হওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী-র XXXIII কর্পস-এর অন্তর্গত ১৭ম পর্বত বিভাগ এর সদর দপ্তরটি এখানে রয়েছে। এই বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে মূলত ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত।

সব সার্বজনীন এলাকায় ধূমপান, আবর্জনা ছড়ানো এবং থুথু ফেলা আইনত অনুমোদিত নয়। দার্জিলিং-এ ভ্রমণার্থীদের অসদৃশ, প্রতিবেশী শহর সিকিমে বিদেশীদের জন্য অবাধ প্রবেশ বিধিনিষেধ রয়েছে। তাদেরকে একটি সংরক্ষিত অঞ্চলের অনুমতিপত্র বা আর.এ.পি. নিয়ে যেতে হয়। এখানে প্রবেশ বিনামূল্যে এবং শুধুমাত্র একটি বৈধ পাসপোর্ট এবং একটি ভারতীয় ভিসা প্রয়োজন।

সিকিমের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা সংরক্ষিত স্থান হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এই সমস্ত স্থানে প্রবেশের জন্য বিদেশী ও ভারতীয়দের প্রবেশের জন্য একটি সুরক্ষিত অঞ্চলের অনুমতিপত্র বা পি.এ.পি. নিয়ে যেতে হয়। নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়, বিশেষ করে সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায়, বিদেশীদের প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

নামগিয়েল ইন্সটিটিউট অফ টিবেটোলজি একটি মিউজিয়াম ও তিব্বতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠের একটি কেন্দ্র যেটি টদঙে রয়েছে। সিকিমের তৎকালীন রাজা তাশি নামগিয়ালের নামানুসারে এটির নাম এবং এর সংলগ্ন রয়েছে দো দ্রুল চোর্তেন আর তাশি ভিউ পয়েন্ট।

দো দ্রুল চোর্তেন একটি বৌদ্ধ স্তূপ যেটি ট্রুলশিক রিনপোচে, এক তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গুরু ১৯৪৫ সালে তৈরী করেন। এর ভেতরে তিব্বতী পবিত্র পুঁথি সংরক্ষিত আছে। এখানে স্তূপটিকে ঘিরে ১০৮টি মণি ল্যাখোর বা প্রার্থনা চক্র আছে, আর আছে গুরু রিনপোচের দুটি মূর্তি। আর আছে একটি মঠ বাচ্চা লামাদের জন্য যার ভেতরে গুরু পদ্মসম্ভবের একটি সুন্দর মূর্তি আছে।

অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সিনিয়লচু শৃঙ্গ আর ফোডং আর লাবরং মঠ দেখতে অবশ্যই যেতে হবে তাশি ভিউ পয়েন্ট। রেলিং ঘেরা ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে যেখানে দাঁড়ালে প্রকৃতির সীমাহীন উন্মুক্ততাকে অনুভব করা যায়। আমরা গেলাম, ঘুরে ঘুরে উঠে নিচে তাকিয়ে দেখলাম রুপালি ফিতের মত একটি নদী অনেক নিচে, এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা রঙবেরঙের শালু আর দূরে সবুজ নিস্তব্ধ বনবীথিকা। মনে যেন এক অপার শান্তির প্রলেপ লাগল ওখানে দাঁড়িয়ে। আমার ছোট্ট মেয়ে নির্ভয়ে টুকটুক করে উঠে গেল হাতে নিয়ে একটুকরো ফার্ন।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের সারথি সঞ্জয়ের আগ্রহে আমরা গেলাম লিঙডাম মনাস্ট্রি দেখতে যেটা উত্তর পূর্ব সিকিমে অবস্থিত, গ্যাংটক থেকে এক ঘণ্টার রাস্তা, ১৯৯৯ সালে তৈরী। আমরা সপরিবারে দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। ছোট ছোট ব্রহ্মচারী লামা, তাদের মিষ্টি হাসিমুখের অভ্যর্থনা, তাদের নিষ্পাপ সরলতা, সহযোগিতা এবং নির্জন পাহাড়ের কোলে ঐ মঠটির কর্মব্যবস্থা সত্বেও নিস্তব্ধতা মনে এক শান্তির প্রলেপ এঁকে দিয়েছিল।

হাজার হাজার বছর ধরে হিমালয়ের উত্তর অংশে দাঁড়িয়ে আছে তিব্বত নামের রহস্যময় এক রাজ্য। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগের কথা। দুর্গম পর্বতমালা, কঠোর আবহাওয়া, তুষারের শীতলতাসহ সকল প্রতিবন্ধকতা পেড়িয়ে, ক্লান্তিকর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং-এর দুর্গম রাস্তা ধরে ১০৪২ সালে আমাদেরই বাংলাদেশের এক কৃতি সন্তান পৌঁছালেন সেই হিমালয় দুহিতা তিব্বতে। সাথে সাথে একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। সেই ঘোড়সওয়ারদের হাতে তীক্ষ্ণ বর্ষার মাথায় পতপত করে উড়ছে শ্বেত পতাকা, সুরতোলা বাদ্যযন্ত্রে বাজছে স্বাগত বাজনা আর সেই সাথে উচ্চারিত হচ্ছে পবিত্র মন্ত্র–'ওম মণিপদ্মে হুম।'

দ্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টস-এ সংরক্ষিত আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের অতীশ দীপঙ্করে প্রতিকৃতি তিব্বতের গু-জে-এর রাজা স্বয়ং গার্ড অফ অনার দিয়ে বরণ করেছিলেন বাংলার এই জ্ঞানতাপসকে, নাম তাঁর শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। অতীশ দীপঙ্করের জন্ম বাংলার বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে। তাঁকে '11th century Tibetan Buddhist master' বা 'একাদশ শতাব্দীর তিবেতান বুদ্ধগুরু' বলা হয়। এবং Om mani

padma hum (ওম মণি পদ্মে হুম) মন্ত্রটি বাংলার বজ্রযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের মন্ত্র হলেও বর্হিবিশ্বে এই মন্ত্রকে তিবেটান (তিব্বতের) মন্ত্র হিসেবে জানে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ শতক থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ বছর ধরে তৎকালীন বাংলায় আর্য ভাবধারা বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে বাংলায় ধীরে ধীরে বৌদ্ধ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এই সভ্যতা দুইটি মূলধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি 'মহাযান' এবং অন্যটি 'হীনযান।' 'মহাযান' অর্থ-'মহৎ মার্গ' অর্থাৎ যে মহৎ পথে যান বা শকট চলে সেই পথ। মহাযানীরা মনে করেন প্রতিটি মানুষের ভিতরেই বুদ্ধ বিদ্যমান। সে বুদ্ধত্ব অর্জন করতে হলে দরকার সাধনা ও জ্ঞানের, প্রজ্ঞার। যে ব্যক্তি বুদ্ধ নির্দেশিত নির্বাণে উপনীত হতে এবং বুদ্ধত্ব লাভে আগ্রহী, সে যে মহৎমার্গ বা উপায় অবলম্বন করে তারই নাম 'মহাযান।' হীনযানীরা বুদ্ধত্ব লাভে আগ্রহী নয়, তারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের এবং তপস্যার মাধ্যমে নির্বাণ লাভে আগ্রহী। এ জন্য মহাযানীরা এ মতকে হীন মনে করে। দুটি সম্প্রদায়ের বিভক্তির এটিই মূল কারণ।

৫২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত যুগের পতনের পর ভারতবর্ষে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ অবনতি ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে সুনীল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন–'গুপ্তযুগের সমাপ্তির পর থেকে সমবেদী মায়াবিদ্যা ও যৌনঅতীন্দ্রিয়বাদের আদিম ধারণা ভারতীয় ধর্মে পরিব্যপ্ত হয়েছিল' (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা; ১৪০)।

BANGLADARSHAN.COM

এই আদিম বা আর্যপূর্ব ধারণা বৌদ্ধমতকেও প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে অষ্টম শতকে বাংলা ও বিহারে (মগধে) মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে 'বজ্রযান' নামে একটি মতবাদ গড়ে ওঠে। বিক্রমপুর বা বিহারের বিক্রমশীলা মঠটি ছিল বজ্রযানী বৌদ্ধদের অন্যতম সাধনমার্গ। একাদশ শতকে এই মঠের বজ্রপন্থিগণ তিব্বতে ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাদেরই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। এই বজ্রযানেরই প্রধান মন্ত্র হল: 'ওম মণি পদ্মে হুম।' যার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় "মণিই প্রকৃত পদ্ম।" কিন্তু এই মন্ত্রের মাঝেই লুকিয়ে আছে সম্পূর্ণ বজ্রযান তথা বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষা।

'ওম মণিপদ্মে হুম' ছয়টি শব্দাংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্কৃত মন্ত্র যা বৌদ্ধ সভ্যতার চার হাতওয়ালা ছায়া দেবতা 'অবলোকিতেশ্ব'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবলোকিতেশ্বর হলেন বোধিসত্ত্বগণের অন্যতম মধ্যে যিনি সকল বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রকাশমান করুণার আধার। মূলধারার মহাযান বৌদ্ধধর্মে ইনিই হলেন সর্বাধিক পূজিত বোধিসত্ত্ব এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যতক্ষণ এই পৃথিবীতে একটিও প্রাণী বদ্ধ থাকবে ততক্ষণ তিনি নির্বাণলাভ করবেন না। অবলোকিতেশ্বর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন তিব্বতি ভাষায় তাঁর নাম 'চেনরেজিগ।' তিনি হাতে পদ্ম ধারণ করে থাকেন বলে কখনও পদ্মপাণি হিসেবেও অভিহিত হন। আবার তিনি লোকেশ্বর অর্থাৎ জগতের প্রভু নামেও পরিচিত। তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মানুসারে অবলোকিতেশ্বর দলাই লামা, এবং কারমাপা রূপে জীবকুলের মঙ্গলার্থ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বজ্রযানীগণ বিশ্বাস করতেন দেবদেবীদের করুণা ভিক্ষা করে লাভ নেই। এদের বাধ্য করতে হবে। যে গ্রন্থে এই বাধ্য করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় 'তন্ত্র।' মন্ত্র এবং যন্ত্র-এ দুই হল বজ্রযানের সাধনার উপকরণ। যে কারণে বজ্রযানকে বলা হয় 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম।' আর 'যন্ত্র' হল 'মোহিনী প্রতিক', যা সঠিকভাবে আঁকতে হয়। মোহিনী প্রতিক হল 'Religious Symbolism' যা মার্কিন লেখক ড্যান ব্রাউন আধুনিক পাঠকের কাছে অনেকাংশে পরিচিত করে তুলেছেন। আর পদ্মকে বৌদ্ধধর্মে বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বজ্রযানীদের প্রধানা দেবী হলেন তারা। ইনি ছিলেন বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদের স্ত্রী। মাতঙ্গী, পিশাচী, ডাকিনী, যোগিনী প্রমুখ তুচ্ছ দেবীও বজ্রযানীদের আরাধ্য ছিল। 'ওম মণিপদ্মে হুম' মন্ত্রটি বুদ্ধ এবং প্রজ্ঞাপারমিতার এবং বোধিসত্ত্ব এবং তারা দেবীর যৌনমিলনের প্রতীক।

মহাযানীপন্থার অন্যতমা দেবী ছিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযানীরা বুদ্ধত্ব লাভে আগ্রহী এবং বোধিসত্ত্ব মতবাদে বিশ্বাসী। বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন তিনি যিনি বারবার জন্মগ্রহণ করেন এবং অপরের পাপ এবং দুঃখভার গ্রহণ করে তাদের আর্তি দূর করেন। মহাযানীপন্থায় যে কয়েকজন বোধিসত্ত্ব রয়েছেন। এঁদের মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং বজ্রপানি প্রধান। প্রজ্ঞাপারমিতা কে বোধিসত্ত্বেরই গুণাবলীর মূর্ত রূপ বলে মনে করা হত। বোধিসত্ত্বদের স্ত্রী কল্পনা করা হয়েছিল। এই দেবীই ছিলেন দেবতাদের প্রকৃত শক্তি। দেবতাকে মনে করা হত সদূর এবং অজ্ঞেয় এবং দেবীকে সক্রিয় মনে করা হত। মহাযানীরা বিশ্বাস করতেন যে দেবতাকে পেতে হলে দেবীর সাহায্য নিতে হয়। সৃষ্টিকে ভাবা হত যৌনমিলনের প্রতীক। কাজেই কোনও কোনও মহাযানী সম্প্রদায়ে যৌনমিলন ধর্মীয় আচারে পরিণত হয়েছিল। এই যৌনবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মরমী অতীন্দ্রিয়বাদ।

BANGLADARSHAN.COM

সে যাই হোক, 'ওম মণি পদ্মে হুম' মন্ত্রটিকেই বুদ্ধ ধর্মের সকল শিক্ষার বীজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'Om' 'ma' 'ni' 'pad' 'me' 'hum' এই ছয়টি শব্দাংশের সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রটির প্রতিটি শব্দাংশ আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রদান করে। শব্দগুলো সাধারণত কিছু পবিত্র পাথর বা 'মণি পাথর' নামে অভিহিত করা হয় তার গায়ে খোদাই করা থাকে। অথবা কাগজ বা কাপড়ে লিখে প্রার্থনা চক্রে (প্রেয়ার হুইল) লাগানো থাকে। এই মন্ত্রটি চক্রে একবার ঘোরানো হলে এরপর যতবার ঘুরতে থাকে ততবারই মন্ত্রটি উচ্চারিত হয় বলে ধারনা করা হয়। শব্দগুলোকে বিভিন্ন বৌদ্ধ স্কুল নানা ভাবে অনুবাদ করে থাকে। অনেক লেখকই মনে করেন যে 'মণিপদ্ম' একটি যৌগিক শব্দ। সংস্কৃতে কোন বড় হাতের অক্ষর না থাকায় মন্ত্রটি অনুবাদ করতে গিয়ে বড় ও ছোট হাতের অক্ষর জনিত কারণে এর ভাবার্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। মন্ত্রকে অনুসারীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। এমনকি শব্দগুলো একটি নিছক সিকোয়েন্সের মতো যার প্রভাবগুলো কঠোর অর্থের বাইরে চলে যায়।

মাঝের শব্দদ্বয় (মণিপদ্ম) কে একত্রে 'পদ্মের রত্ন' বা ইংরেজীতে 'লোটাস ইন দ্য জিয়েল' বলা হয়। সংস্কৃতে 'মণি' কে কখনও কখনও দেবী চিন্তামণির সাথেও তুলনা করা হয়ে থাকে; যা পদ্ম ফুলের মাঝে তাঁর

অবস্থানকে নির্দেশ করে। কিন্তু ডোনাল্ড লোপেজের মতে, এটি আসলে অধিকরণ বা স্থানসূচক কিছুকে নির্দেশ করে না। বরং এটি একটি উচ্চারণগত পার্থক্য যা বৌদ্ধসভতার দেবতা অবলোকিতেশ্বর এর একটি উপাধিকে নির্দেশ করে। এটি পূর্বে 'ওম' ও পরে 'হুম' শব্দের মাঝে অবস্থিত যা ভাষাগত অর্থ ছাড়াই ব্যবহৃত হচ্ছে।

লোপেজ আরও বলেন যে অধিকাংশ তিব্বতি বৌদ্ধ গ্রন্থে মন্ত্রকে অনুবাদ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন–চেংরিগ সাধনায় এই ছয়টি শব্দ রাজ্যের অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে।

পদ্মফুল বিশুদ্ধতার প্রতীক। সুতরাং 'প্রকৃত পদ্ম', মানে 'প্রকৃত বিশুদ্ধতা' হতে পারে। তাহলে 'মণি' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার হচ্ছে? বলা হয় যে, এই মন্ত্রের মধ্যেই বুদ্ধের শিক্ষা রয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বুদ্ধ প্রকৃত বিদ্যমান। আমাদের প্রত্যকের মধ্যেই বিশুদ্ধতার বীজ রয়েছে, এটার উন্নয়ন সাধন করে বুদ্ধত্বে রূপান্তরিত করতে হবে। আমাদের সাধারণ দেহ, বাক্য ও মন বিশুদ্ধ হয়ে রূপান্তরিত হবে বুদ্ধের পবিত্র দেহে, বাক্যে ও মনে। আর 'ওম মণিপদ্মে হুম' সেই পথটির অনুশীলন করে যা কিনা পদ্ধতি (মেথড) ও প্রজ্ঞা (উইজডম) এর অবিভাজ্য সংযুক্তি। এই মন্ত্রের পথ ধরেই আমরা আমাদের অশুদ্ধ দেহ, বাক্য এবং মনকে রূপান্তর করতে পারি একজন বুদ্ধের মহিমান্বিত দেহ, বাক্য এবং মনে।

স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, ওম (আউম) হলো সব। 'ওম' হলো ঈশ্বর ও ব্রহ্মার নাম ও প্রতীক। ওম হলো সত্যিকারের নাম। ওম মানবের ত্রিগুণিত অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। ওম হলো বাহ্যিক জগৎসমূহ। ওম থেকে জ্ঞান-মহাবিশ্ব অভিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহাবিশ্ব টিকে আছে 'ওম'-এর উপর আবার বিলিনও হবে 'ওম'-এ।

BANGLADARSHAN.COM

ওম (ওস্ বা অউম) শব্দটিকে বিচ্ছেদ করলে আমরা পাই। এখানে 'অ' 'বিষ্ণু', 'উ' 'মহেশ্বর শিব' ও 'ম্' 'ব্রহ্মা' কে নির্দেশ করে। একে মনে করা হয় সকল মন্ত্রের আদিবীজ। সামবেদের শব্দ অবয়বের প্রথম অবয়ব। ভাগবতে এই বীজের উৎপত্তি। পরমেষ্ঠ আত্মসংযম করার পর, তাঁর হৃদয়াকাশ হতে এই শব্দ উৎপন্ন হয়েছিল। হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হতে এর উৎপত্তি। এটি নিজের আশ্রয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচক; সর্ব্বমন্ত্র ও উপনিষৎ স্বরূপ। এটিই বেদের সনাতন বীজ।

'অ' শারীরিক সমতলকে প্রতিনিধিত্ব করে। 'উ' মানসিক এবং নাক্ষত্রিক সমতল, বুদ্ধিমান আত্মার জগৎ, সকল স্বর্গ। 'ম' গভীর ঘুমের দশা-কে প্রতিনিধিত্ব করে, এমনকি সকল কিছু যা কিনা জাগ্রত অবস্থায়ও অজানা, এবং সেইসব কিছু যা কিনা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির নাগালেরও বাইরে। এইভাবে 'ওম'-ই সব আমাদের জীবন, চিন্তন ও বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি। সমগ্র বিশ্বজগত 'ওম' থেকে উদ্ভুত, 'ওম'-এ অবস্থিত এবং 'ওম'-এই বিলীন হবে।

'মণি' শব্দের অর্থ রত্ন, ফসিল (বীজকোষ)। বিশুদ্ধরত্ন হলো ভালোবাসা ও দয়ার প্রতীক। এবং তা জ্ঞানদীপ্ত হওয়ার বাসনাকে প্রতীকী রূপ দান করে। 'মণি' হলো 'মায়া', 'বাসনা', 'সংসার' ও 'নির্বাণ'-এর উদ্ভব।

‘পদ্মে’ মানে কমল যা কিনা প্রজ্ঞার, জ্ঞানের উদ্দীপনার প্রতীক। একটি পদ্মফুল যেমন পংক থেকে ওঠে তেমনি প্রজ্ঞাকে মানব অবস্থা থেকে স্বর্গীয় গুণ অর্জন করা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সকল প্রজ্ঞার মূল প্রজ্ঞা হলো ‘নীরবতা ও শূন্যতার প্রজ্ঞা।’ ‘পদ্মে’ মানে শূন্যতা (এমটিনেস)।

বোধিসত্ত্বাকে সাহায্যরত অবলোকিতেশ্বরের চিত্রকর্মটি মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টস-এ তৈরীকৃত। সূত্রঃ দ্য সান

‘হুম’ প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির সংযুক্তি ঘটায়। এটা অবিভাজ্যতা, স্থবিরতা, যাকে আন্দোলিত করা যায়না। এটা জ্ঞানদীপনের মনন কে উপস্থাপন করে। ‘হুম’ যন্ত্রণাকে ধ্বংস করে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে কখনও একে এভাবেও দেখা হয়ে থাকে–‘ওম মণিপদ্মে হ্রং’ অর্থাৎ দেবকুলে(ওম), অমরকুলে(ম), মানুষরূপে(নি), পশুরূপে(প), হতাশরূপে(দ্মে), নারকিরূপে(হুম বা হ্রং)–পুনর্জ্জন্ম নিরোধ করে। এই মতানুসারে পুনর্জন্মের ছয় অবস্থাস্বচক ছয় বর্ণ উক্তি ছয় অক্ষরে আরোপিত হয়ে থাকে। আবার কখনও একে বৌদ্ধ শাস্ত্রের আত্মায় ছয়টি পরিশোধনের নির্দেশক হিসেবে ভাবা হয়। এই ছয়টি পরিশোধন হলো–গৌরব বা অংহ (ওম), ঈর্ষা বা কাম (মা), আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা (নি), অজ্ঞতা বা কুসংস্কার (প), লোভ (দ্মে), ঘৃণা (হুম)। কখনও একে বৌদ্ধ ধর্মের ছয়টি রঙের নির্দেশক হিসেবে কল্পনা করা হয়–সাদা (ওম), সবুজ (ম), হলুদ (নি), নীল (প), লাল (দ্মে), কালো (হুম)। এখানে কালো মূলত বাকি পাঁচটি রঙের সমন্বয় হিসেবে দেখানো হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

কখনও মহাযানীদের ছয় পারমিতাকে এই ছয়টি শব্দাংশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে বলে ধারনা করা হয়েছে। এই ছয় পারমিতা হল–দান(ওম), শীল(ম), ক্ষান্তি(নি), বীর্য(প), ধ্যান(দ্মে) ও প্রজ্ঞা(হুম)। এই ছয় পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞা পারমিতাকে মূখ্য রূপে দেখা হয়েছে। প্রজ্ঞা পারমিতার মৌলিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ উচ্চতর জ্ঞানের লাভের উপায় যা শূন্যতার প্রতিপাদক। প্রজ্ঞা পারমিতার বুৎপত্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে ‘অষ্ট সহস্র প্রজ্ঞা পারমিতা’ গ্রন্থে বলা হয়েছে সর্বধর্ম অনুপলব্ধকে প্রজ্ঞা পারমিতা বলা হয়েছে। এর গুরুত্ব প্রতিপাদনে শত সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতাকে বলা হয়েছে চন্দ্র, সূর্য যেমন চতুদ্বীপ উদ্ভাসিত করে তদ্রুপ প্রজ্ঞা পারমিতা ও অন্য পারমিতা সমূহকে পরিশোধিত করে। ক্রিয়াযোগের আদিপুরুষ মহাবতার বাবাজীর একটি জন্ম গৌতম বুদ্ধ এবং তাই বাবাজী মহারাজকে আদি বিষ্ণু বা নারায়ণের সত্তা মানা হয় যিনি কয়েক কল্প ধরে আছেন লোককল্যাণের ব্রত নিয়ে।

বৌদ্ধ ধর্ম ও তিব্বতের প্রসঙ্গের অবতারণা করার কারণ গ্যাংটকের দুটি মনাস্ট্রি, রুমটেক মনাস্ট্রি আর লিংডাম মনাস্ট্রি এবং নামগিয়েল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি ও তৎসংলগ্ন দ্রো দ্রুল চোর্তেন দর্শন। রুমটেক মনাস্ট্রি সিকিমের সবচেয়ে বড়ো মনাস্ট্রি যেখানে বজ্রযোগিনী তারার সাধনার ধারা আজো বজায় রয়েছে, অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এখানে, প্রচুর শিক্ষানবিশ লামা আছে সেখানে, কিন্তু ভীষণ ভীড় আর অন্যতম প্রধান মঠ বলে এর গুরুত্বও বেশি। ষোড়শ শতাব্দীতে নবম কর্মপা ওয়াংচুক দোর্জে এই মঠটির প্রতিষ্ঠাতা। সিকিমের অতীত ইতিহাসের সাথে একাত্ম হয়ে রয়েছে লামাতন্ত্র। আর এখানকার রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধ। ইদানীং বৌদ্ধ ধর্মের

প্রতি আমার এক অদ্ভুত আকর্ষণ জন্মেছে। তা পায়ে পায়ে একদিন পৌঁছে গেলাম রুমটেক মনাস্ট্রি। গ্যাংটক থেকে চব্বিশ কিমি দূরে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মনাস্ট্রি হল এই রুমটেক মনাস্ট্রি। আর প্রথমটি অরুণাচলপ্রদেশে অবস্থিত। রুমটেক মনাস্ট্রি ওঠার পথটি অসাধারণ। তবে বেশ চড়ায় রয়েছে। প্রকৃতিকে নিজের মত করে উপলব্ধি করতে করতে ওপরে ওঠা। পথে দেখা মিলবে লামাদের। বিভিন্ন বয়সের লামা। অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে মুখ জুড়ে। রুমটেক মনাস্ট্রি ঘুরে দেখতে হাতে অনেকখানি সময় থাকা প্রয়োজন। গ্যাংটক থেকে একটি বাস ছাড়ে বিকেলে, রুমটেক সেটি পরদিন সকালে ফেরে। রুমটেক মনাস্ট্রির পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে রোমাঞ্চ। মূল প্রবেশদ্বারে চেকিং হয়। দেখাতে হয় পরিচয়পত্র। আর মনাস্ট্রিতে প্রবেশের আগেও হয় আরেকপ্রস্ত চেকিং। এত কড়াকড়ির কারণ, মনাস্ট্রিটি তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত।

মনাস্ট্রিটি প্রায় হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন। চিন তিব্বত দখল করার পর গেলওয়া কর্মাপা সম্প্রদায়ের ষোড়শ গুরু সিকিমে এসে আশ্রয় নেন। সে সময়ই এর নির্মাণকার্য শুরু হয়। তবে এখানকার আদি গুম্ফাটি নির্মাণ করান নবম গুরু কর্মাপা। যা আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। রাজা চতুর্থ চোগিয়ালের বানানো মনাস্ট্রিটিও ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। পরে তিব্বতের বিখ্যাত ছোফুক গুম্ফার অনুকরণে তৈরি হয় রুমটেক। ষাটের দশকে সেজে ওঠে রুমটেক। এখানে রয়েছে সোনার একটি বুদ্ধমূর্তি। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম এর নানান গাঁথা রয়েছে এখানে। অসাধারণ মূর্যা লে গুম্ফাটি সাজানো। আর রয়েছে প্রাচীন পুঁথিপত্রের বিপুল সম্ভার। পালি ভাষায় লেখা। চাইলে পড়া যায়, কিন্তু অনুমতি নিতে হয়, সাথে ভাষা জানাটাও জরুরি। শান্ত পরিবেশ। যেন পুরো পরিবেশই ধ্যানে মগ্ন।

BANGLADARSHAN.COM

সারাবছরই এই রুমটেক মনাস্ট্রিতে হয় নানান ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান। যার মধ্যে অন্যতম হল, লামাদের মুখোশ নৃত্য–ছাম। গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে–ছৌ নাচের উৎপত্তি নাকি এই ‘ছাম’ থেকে। প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পূর্ণিমারাতে হয় এই নাচ। মনাস্ট্রি ঘুরলে দেখা মিলবে লামা নৃত্যের অসংখ্য মুখোশ। দেখতে দেখতে অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতে হয়।

একসময় আমার ধারণা ছিল এখানকার এই ছোট্ট ছোট্ট গেরুয়া জড়ানো ছেলেগুলিও লামা। আসলে কিন্তু তা নয়, এরা এসেছে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করার উদ্দেশ্যে। আর এখানে গেরুয়া হল অনেকটা আমাদের ‘স্কুল ইউনিফর্ম’-এর মত।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শান্ত আশ্রমে কাটালাম বেশ খানিকটা সময়। বেরনোর সময় মন আপনা থেকে বলে উঠল– “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।”

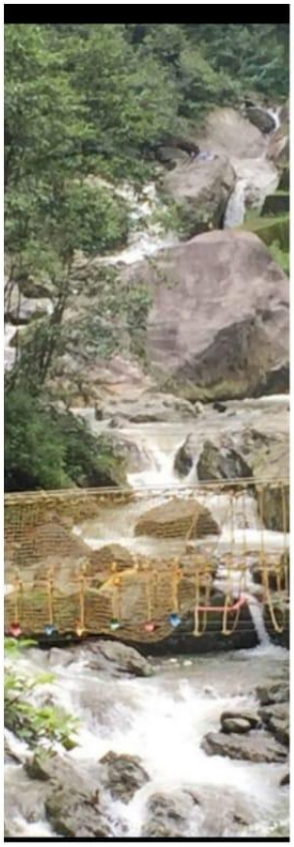

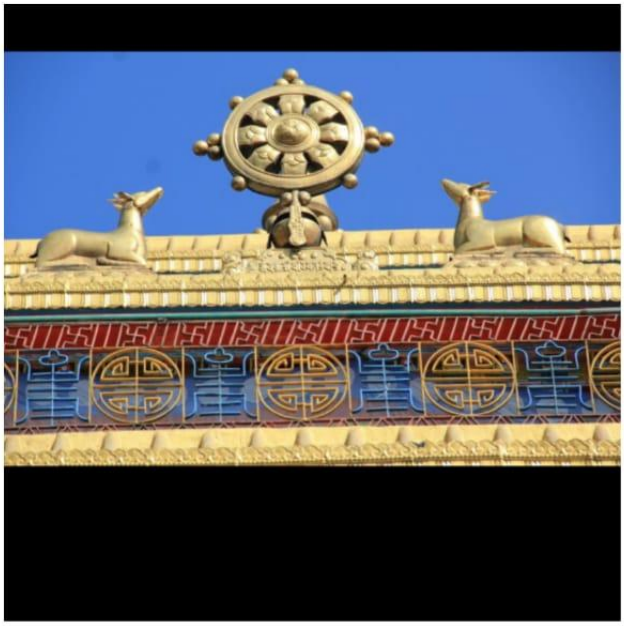

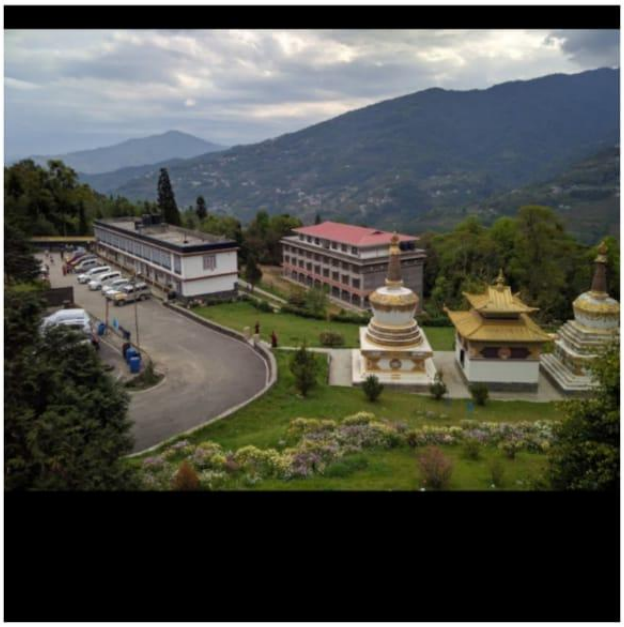

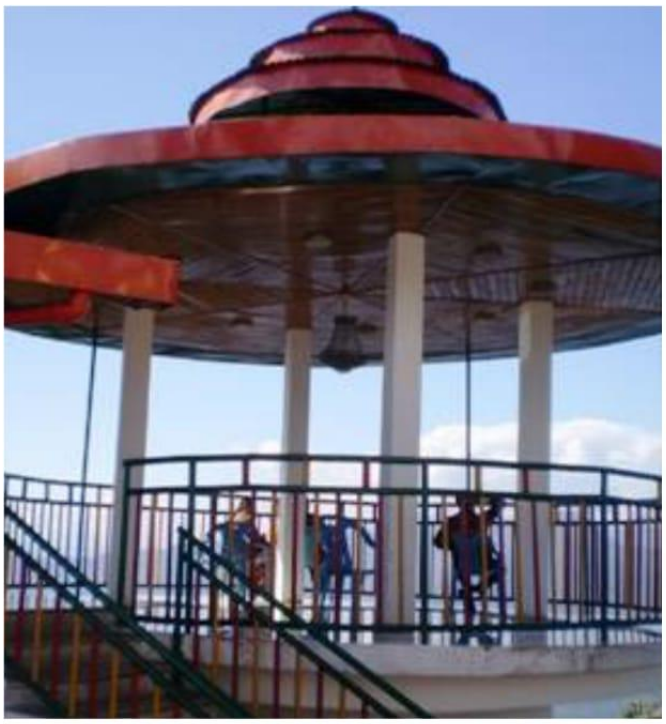

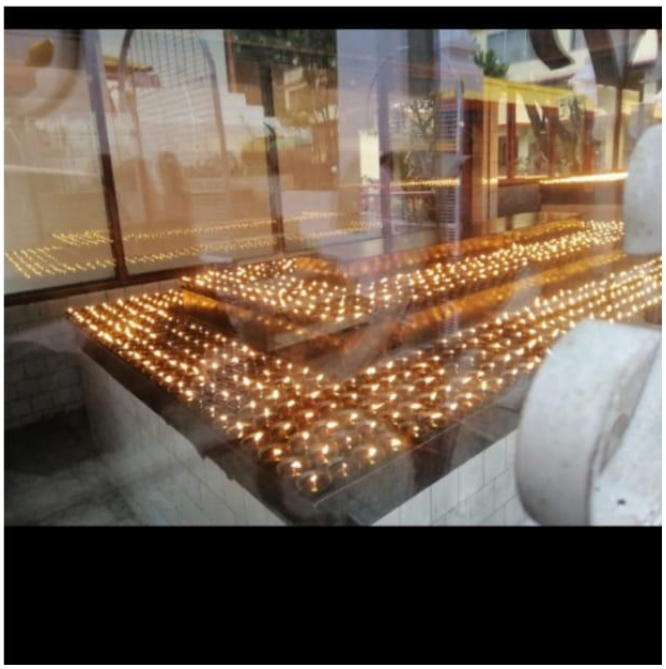

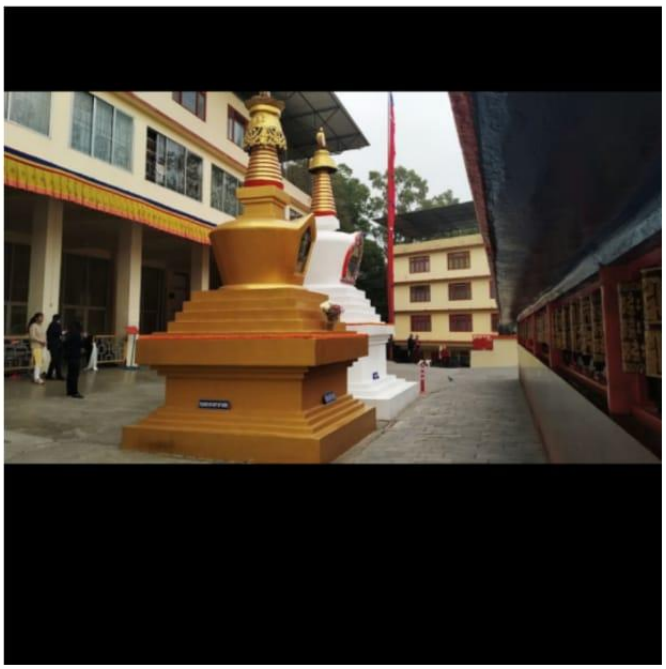

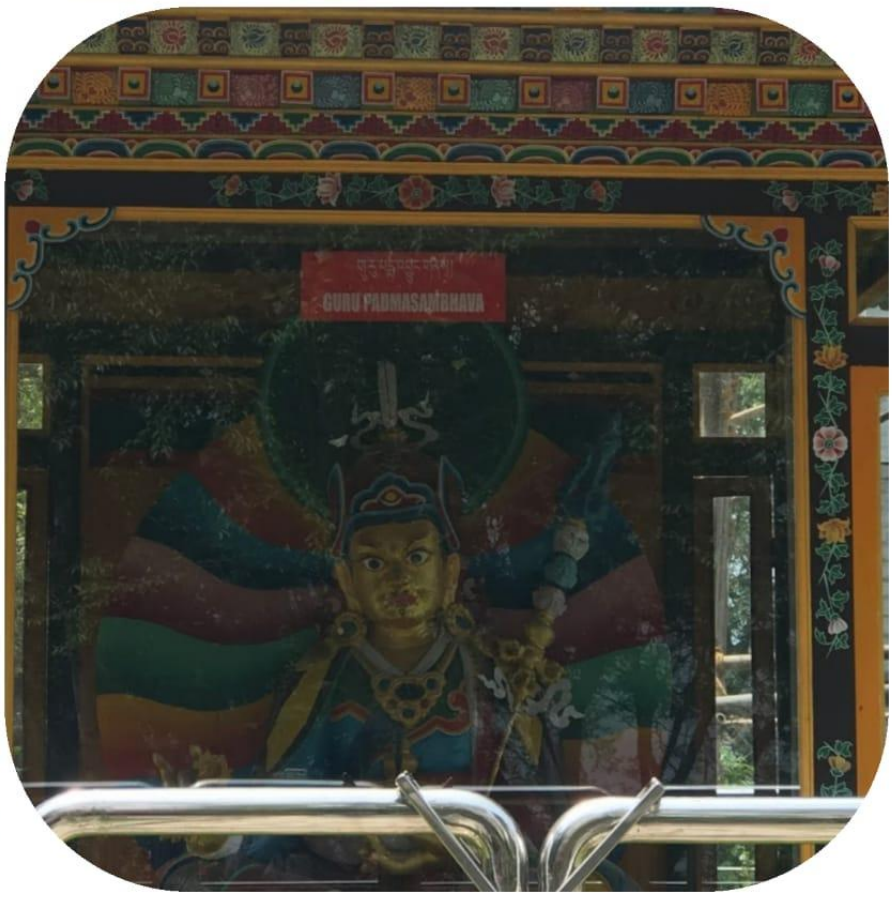
GURU PADMASAMBHAVA

দোদ্রুল চোর্তেন

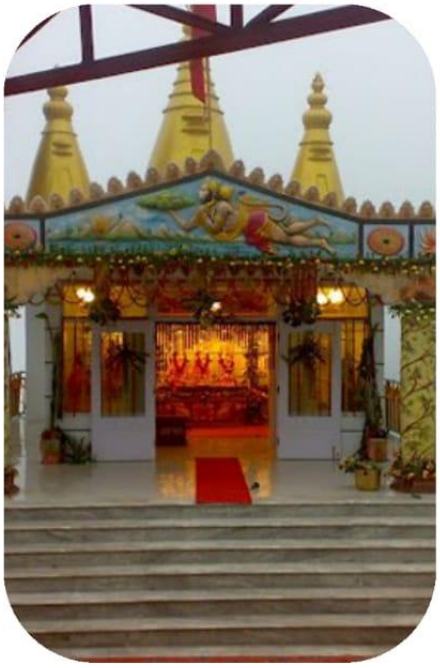

গনেশটক আর হনুমানটক

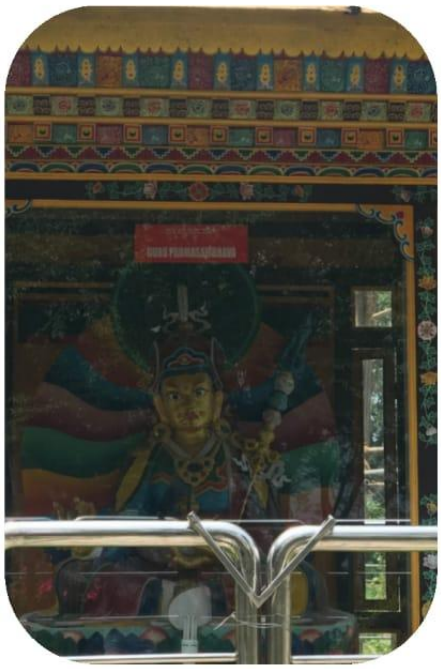

নামগিয়াল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি

তাশি ভিউ পয়েন্ট

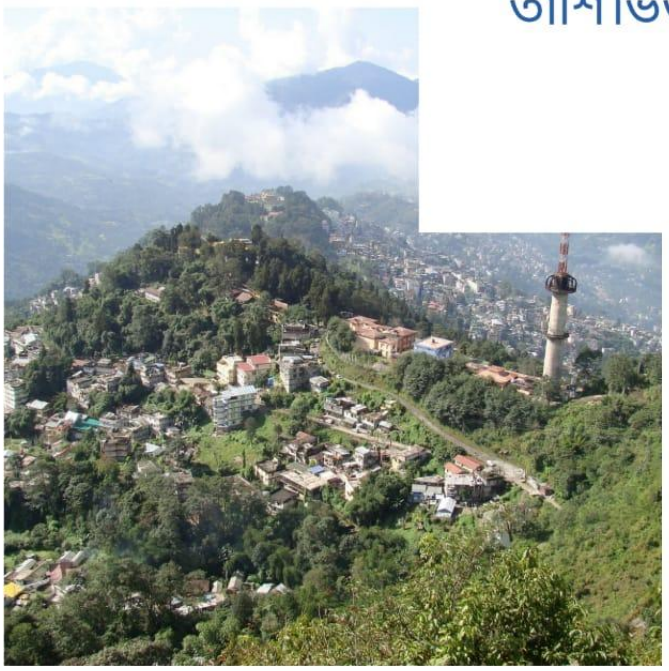

॥পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপধাম॥

“যং লব্ধা চ অপরম্ লাভম্ মন্যতে নাধিকম ততঃ॥
যস্মিনস্থিতঃ ন দুঃখেন গুরুনা অপি বিচাল্যতে॥” গীতা ৬/২২

অর্থ–যোগ অভ্যাসের ফলে যে অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ রূপে জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়, সেই অবস্থাকে যোগ সমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী পরম আনন্দ আস্বাদন করে। সেই আনন্দ অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভব হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত বলে যোগী আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না, এবং তখন আর অন্য কিছু লাভই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে চরম বিপর্যয়েও চিত্ত বিচলিত হয় না। জড় জগতের সংযোগ জনিত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে এটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি।

এই শ্লোকের উপস্থাপনা এখানে করলাম যে কারণে সেটি একটু বিশদে বলি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। যোগতত্ত্ব ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানবার জন্যে বিভিন্ন বইপত্র সংগ্রহ করছি, এই সময়ে আমাদের গুরুমাকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, “যং লব্ধা পড়েছ? ওটা পড়।” সেই বই পড়তে গিয়ে প্রথম জানলাম সাধু পাতালদেব, তাঁর অলৌকিক সাধনপদ্ধতি ও তাঁর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাধনা সম্পর্কে। ওঁর শিষ্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুইঁ মহাশয় খুব নিপুণ এবং ধাপে ধাপে শ্রীচৈতন্যদেব পার্ষদ নরহরি ঠাকুরের পাতালদেব রূপে আবির্ভাব, বাল্যলীলা, সাধুসঙ্গ, গুরুপদাশ্রয় ও গুহাভ্যন্তরে বসে সাধনা, সিদ্ধি লাভ, আশ্চর্য জীবন আর তাঁর জীবন দর্শন, সেইসব কিছু সুন্দর বর্ণনা করেছেন ওই বইটাতে। বইটা জোগাড় করে পড়েছিলাম, পড়ে সংগ্রহে রাখতে গিয়ে জানতে পারলাম ওই বই বাইরে উপলব্ধ নয়, পাতালসাধুর আশ্রমেই একমাত্র পাওয়া যায়। অনেকবার বইটি কেনার চেষ্টা করেছি, পাইনি। এখানে একটু বলে রাখা দরকার, আমার কোনো বই পড়ে ভালো লাগলে আমি চেষ্টা করি তা সংগ্রহে রাখতে, ফলে এমন বইয়ের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আমার ঘরে বসার সোফাটাতেও বই ভরে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন-মনে কেউ তা মানেনা॥

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না॥

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,

এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক তো এসেছিলই, নাহলে হঠাৎ কেন এইভাবে গেলাম? ২০১৮ সেপ্টেম্বর মাসে মেয়ের পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শেষ হলে আমাদের ইচ্ছে একটু কোথাও ঘুরে আসি, মেয়ের বাবার সেই সময়ে চেন্নাইতে গ্লোবাল মিট ছিল, সে সেখানে চলে গেল। আমি আর মেয়ে কোথায় যাব আলোচনা করতে বসে ও হঠাৎ বললো যে আমরা নবদ্বীপ যেতে পারি কিনা, এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে সকালে গিয়ে রাত্রের মধ্যে ফিরতে পারা যাবে। নেট দেখে ঘেঁটে শুনে আমরা একটা সোমবার সকালে বালুরঘাট এক্সপ্রেসে রিজারভেশন করে ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরোলাম, মা আর মেয়ের একইরকম এডভেঞ্চার এই প্রথম।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহান সমাজ সংস্কারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং বাসস্থান হল নবদ্বীপ। পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর তীরে, নদীয়া জেলায় অবস্থিত নবদ্বীপ, একটি ঐতিহাসিক শহর। কৃষ্ণনগর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নবদ্বীপ শহর লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল। সেন বংশের এক মহান শাসনকর্তা, রাজা লক্ষণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ শাসন করেন। এছাড়াও, নবদ্বীপ মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি দ্বারা অধিকৃত মুসলিম শাসনাধীন ছিল। বিগত দিনে এই শহর শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

বর্তমানে নবদ্বীপ একটি প্রধান ধর্মীয় এবং তীর্থযাত্রা কেন্দ্র, যা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত এবং দর্শকদের আকর্ষণ করে। এই পবিত্র স্থানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে সমস্ত দেশ এবং সারা বিশ্ব থেকে পর্যটক ও ধর্মীয় অনুগামীরা নবদ্বীপ পরিদর্শন করতে আসেন।

নবদ্বীপ শহর বা তার আশেপাশের প্রধান আকর্ষণ গুলি হল:–

বিভিন্ন মঠ।

সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির।

মায়াপুর।

ইসকন মন্দির কমপ্লেক্স।

নবদ্বীপকে সহজেই একটি মন্দির নগরী হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে কারণ এই শহর অনেক পুরাতন এবং নতুন মন্দিরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত। এই মন্দিরগুলি শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার অগ্রহায়ণ মাসে নবদ্বীপ রাস উৎসবে আনন্দে মেতে ওঠে। এক সময় ‘অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল’ বলা হত নবদ্বীপকে। সাহিত্য চর্চা ও সংস্কৃত বিদ্যালাভের পীঠস্থান ছিল আজকের এই নবদ্বীপ। প্রায় হাজার বছরের পুরনো এই জনপদে ১৪৮৬ সালে দোল পূর্ণিমায় আবির্ভূত হন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নরহরি চক্রবর্তী প্রচার করলেন নবদ্বীপ হচ্ছে 'নয়টি দ্বীপের সমষ্টি।' তিনি বলেন–

"দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব-পশ্চিম তিরেতে দ্বীপ নয়।
পুরবে অন্তদ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চম পশ্চিমে প্রচার॥"

নরহরি চক্রবর্তীর পূর্বে রচিত বিশাল-বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও নবদ্বীপকে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলা হয়নি। তিনিই প্রথম নয়টি স্থানকে দ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত করে প্রচার করেন। বাংলায় সেন রাজাদের আমলে নবদ্বীপ ছিল বাংলার রাজধানী। লক্ষণ সেন গৌড় থেকে তার রাজধানী সরিয়ে আনেন নবদ্বীপে। ১২০৬ সালে লক্ষণ সেনের আমলে বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ জয় করেন ও তখন থেকেই বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসন শুরু হয়। তখন নবদ্বীপ ছিল বাংলার শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে প্রধান পীঠস্থান। শ্রীচৈতন্যদেব এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ভিটা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও নবদ্বীপে বর্তমানে ১৮৬টি মন্দির আছে ও সবগুলিতেই ভজন ও কৃষ্ণনাম হয়। নবদ্বীপ মানেই শ্রীচৈতন্যদেব, লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া আর জগাই, মাধাই। নবদ্বীপ মানেই "মেরেছো কলসির কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেবোনা।" গঙ্গার প্রবাহ বদলে বিভ্রান্তি ঘটেছে জন্মভিটে নিয়ে। তবে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম আজকের নবদ্বীপে। জন্মভিটে নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটলেও ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গপ্রভুর মন্দির। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত দারু নির্মিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ মন্দির, বুড়ো শিব, হরিসভা, পোড়ামাতলা মহাপ্রভু মন্দির, অদ্বৈতপ্রভু মন্দির, জগাই-মাধাই, শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মভিটায় নিত্যানন্দপ্রভুর মন্দির, বড় আখাড়া, শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউ, সোনার গৌরাঙ্গ, সমাজবাড়ি, বড় রাধেশ্যাম, রাধাবাজারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মণিপুর পাড়ায় সোনার গৌরাঙ্গ এসবই নবদ্বীপের দর্শনীয়। মন্দিরের উপনিবেশ যেন নবদ্বীপ পুরসভার হিসাবে ১৮৬টি মন্দির।

BANGLADARSHAN.COM

আর নবদ্বীপ মানেই উপলব্ধিতে যে বিষয়গুলি একে একে উঠে আসে তা হল–সারস্বত সমাজ, গোবিন্দ বাড়ির বিখ্যাত মহাভোগ, লাল দই-মিষ্টি, কাঁসা-পিতল। নবদ্বীপ মানেই সারা বছর বিদেশীদের আনাগোনা। সারারাত জেগে রাসের শোভাযাত্রা দেখতে অনেকেই আসেন শান্তিপুরে। নবদ্বীপে আছে ছেলে-মেয়ের কাছে বোঝা বৃদ্ধ মা-বাবাদের আশ্রয়দাতা সমাজবাড়ীর রাধেশ্যাম বৃদ্ধাশ্রম। যন্ত্র চালিত নৌকায় চড়ে মায়াপুর ঘুরতে ভালো লাগবে। নৌকোয় চড়ে যেতে যেতে গঙ্গা আর জলঙ্গি নদীর দু'রকম রঙের জল দেখতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপের মহাশ্মশান কাছেপিঠের সব কটি শ্মশানের মধ্যে অন্যতম। নবদ্বীপে পাওয়া যায় অজস্র প্রাচীন পুঁথি। এখনো এখানে আছে টোল পণ্ডিতদের আধিপত্য। নবদ্বীপ মানেই একটি ছোট্ট শহর। নবদ্বীপ মানেই ৯০০ বছরের পুরোনো শহর। নবদ্বীপ মানেই ভারতবর্ষের প্রাচীন শহর গুলির মধ্যে অন্যতম একটি। নবদ্বীপ মানেই সারা

বছর তীর্থ যাত্রীদের আনাগোনা। নবদ্বীপ মানেই পোড়ামাতলার পোড়ামা মন্দির আর ভবতারণ শিবলিঙ্গ জিউ। নবদ্বীপ মানেই শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, আর দোলযাত্রা মানেই লক্ষ লক্ষ দেশী-বিদেশী ভক্তদের আনাগোনা, দোলযাত্রা মানেই বিদেশীদের সাথে বন্ধুত্ব, আর হোলির দিন রং নিয়ে মাতামাতি।

গন্তব্য নবদ্বীপ ধাম, সেই নবদ্বীপ ধাম যেখানে একটা সময়ে শাস্ত্রচর্চা ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান পঠনকেন্দ্র ছিল, আগম-নিগম তন্ত্রের তন্ত্রভূমি ছিল, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের মত তন্ত্রাচার্যের সাধনভূমি যাঁর কল্পনার কালীমায়ের মূর্তি আজ সর্বত্র পূজিতা, শ্রীমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র স্পর্শধন্য ও তাঁর শৈশব, কৈশোরের লীলাক্ষেত্র, মহাপ্রভু পার্ষদ শ্রীবাস, নরহরি ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভুর পুতপদরজঃ ধন্য, ভক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যে স্থল পূণ্যধাম বলে প্রচারিত হয়েছে, সেই নবদ্বীপ ধামের অনন্যতার জন্য আশৈশব নবদ্বীপ ধাম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যেন নিমাইঠাকুট বাস্তবায়িত করে দিলেন টেনে নিয়ে গিয়ে। ট্রেন ছুটে চলেছে, যদিও শরতের শিশির ভেজা সকাল কিন্তু বেশ গুমোট আবহাওয়া, দুপাশে বর্ষাস্নাত ধানক্ষেত, সদ্য পাট উঠেছে, সেগুলো গুচ্ছ করে শুকোনোর জন্যে গাদি বেঁধে দাঁড় করানো, বিস্তীর্ণ হরিৎ ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে আমবাগান, পুকুর, কলাবাগান, আকাশে পেঁজা তুলোর মতো বিক্ষিপ্ত মেঘের আনাগোনা, নাম না জানা বহু নদী, প্রান্তর পেরিয়ে চলেছি, রিসার্ভ কামরা বলে আর বিশ্বকর্মা পুজোর পরে পরেই বলে ট্রেন একদম ফাঁকা, দুদিকের দুটো বড় সিটে জানলা ঘেঁষে বসে আমরা মা মেয়ে গল্প করতে করতে চলেছি, চেকার এসে টিকিট দেখে বলে গেলেন একদম হাত পা ছড়িয়ে বসতে কারণ আমাদের গন্তব্য পর্যন্ত আর কেউ উঠবে না, পেরিয়ে গেলাম বাংলার জামদানি শাড়ির জন্য বিখ্যাত সমুদ্রগড়, বেলা প্রায় দশটায় পৌঁছলাম নবদ্বীপ ধাম। আমরা নেমে ওভারব্রীজ পেরিয়ে আগে গেলাম টিকিট কাউন্টারে ফেরার টিকিট কাটতে কিন্তু শুনি যেহেতু সেটা লোকাল ট্রেন তাই ট্রেনের সময়ের একঘণ্টা আগে টিকিট পাওয়া যাবে। শুনে বেরিয়ে আসছি একজন রিকশাচালক এসে জিজ্ঞেস করলেন নবদ্বীপ ঘুরে দেখব কিনা, উনি আমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন। রাজি হয়ে ওঁর রিক্সাতে বসলাম, দেখি সামনের রডের ওপরে ওঁর বছর দশেকের ছেলে উঠে বসেছে, শুনলাম ছেলেটি শৈশবে মাতৃহারা, মূক ও বধির, সারাদিন বাবার সঙ্গেই এইভাবে ঘোরে, ছেলেটিকে দেখে বিষণ্ণতা ঘিরে ধরল। এই রিকশাচালক লোকটি খুবই ভালো মানুষ, উপকারী বন্ধুর মত আমাদের দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললেন নবদ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি, দেখলাম প্রায় প্রতি ঘরের পাঁচিলে শুকোতে দেওয়া জামদানি আর তাঁতের শাড়ি তার সদ্যকরা নকশা নিয়ে, কেউ কেউ বারান্দায় বসে নকশা প্রস্তুত করছেন। দেখলাম কেশবজী গৌড়ীয় মঠ যেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের নিত্যসেবা হয়, বিরাট চত্বর জুড়ে বাগান, আঙিনা, অতিথিশালা আর বিরাট তিনতলা বিশিষ্ট শ্রীমন্দির যার গোটা দেয়াল জুড়ে বিষ্ণুর দশাবতারের অপূর্ব ফ্রেসকো পেন্টিং করা রয়েছে, বাইরে বেশি গরম বলেই লোকের ভিড় বেশি ছিল না। এরপরে গেলাম দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ যেখানে জলের মাঝখানে মন্দির, সেখানে যাওয়ার জন্য পাড় ঘেঁষে ময়ূরপঙ্খী নাও দাঁড় করানো রয়েছে। সেখান থেকে এলাম চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। সেখান থেকে সোনার গৌরাঙ্গ আর পুরোনো শিবমন্দির দেখলাম, কিন্তু গরমে খুবই কাহিল হয়ে গেছিলাম আমরা।

BANGLADARSHAN.COM

এরপরে আমরা ওই রিকশাচালক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম উনি পাতালসাধুর আশ্রম চেনেন কিনা, তাহলে সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে, উনি আমাদের এনে পৌঁছে দিলেন পাতাল সাধুর আশ্রমে। পাতালসাধুর নামেই রাস্তার নাম। আমরা ভেবেছিলাম পাতালসাধুর আশ্রম থেকে বইটা কিনে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাব যদিও আমাদের শরীর কিন্তু আর চলতে চাইছিল না।

পাতালসাধুর আশ্রমের প্রবেশ পথ, চূড়া আর সেই চূড়ার পাশে বকুলগাছ।

পাতাল সাধুর আশ্রমে ঢুকে দেখলাম তখন ভোগ নিবেদন হচ্ছে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের, আমরা বইয়ের কথা বলতে এক সন্ন্যাসিনী দিদি বেরিয়ে এসে আমাদের বসতে বললেন, তারপর পাখার নিচে বসিয়ে দুজনে দুটো প্লেটে সকালের বাল্যভোগের ফলমিষ্টি আর জল দিয়ে বললেন দুপুরের ভোগ খেয়ে যেতে, আমরা তখন এতো ক্লান্ত যে তাঁর আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাই রিকশাচালক ভদ্রলোককে তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে এসে বসলাম ভেতরে। আমাদের প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রথমে মেয়েকে এক দিদি ভেতরে নিয়ে গেলেন, তারপর সেই সন্ন্যাসিনী দিদি, দেবীমা আমাকেও তাঁর ঘরের ভেতরে ডেকে নিলেন। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অন্ন ভোগ প্রসাদ পেলাম, তারপর ঐ আশ্রমের দিদিরা নিয়ে গেলেন ওপরে পাতালদেবের সাধিকা সহধর্মিনী দীনতারিনী দেবীর বিগ্রহ দর্শন করাতে। ওপরে যেহেতু শুধু মেয়েরাই থাকেন, তাই অন্য কাউকেই ওঁরা ওপরে নিয়ে যাননা কিন্তু আমাদের এতো আন্তরিকতা আর স্নেহ দিয়ে ওই কয়েক ঘণ্টায় আপন করে নিলেন সবাই যে আমরা একেবারে আপ্লুত হয়ে গেছিলাম ওঁদের ব্যবহারে। পাতালদেবের হাতে পোঁতা বকুলগাছ দেখালেন ছাদে নিয়ে গিয়ে, পাতালদেবের সাধনস্থল সেই গুহা, পাতালদেবের বিগ্রহ যেটা বেলা এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায় শুধুমাত্র আমাদের জন্যে খুলিয়ে দেখালেন, “যং লব্ধা” বইয়ের লেখক অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুইঁয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম, বই কিনলাম। বারবার থেকে যেতে বললেন সকলে, কে বলবে আমরা একেবারেই অপরিচিত ছিলাম একে অপরের কয়েক ঘণ্টা আগে? তারপর বেলা টিনটেতে আমরা বেরোলাম, ওঁরা বেরিয়ে এসে আমাদের টোটোতে তুলে দিয়ে গেলেন।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা সোজা এলাম ফেরি ঘাটে। ওখানে টিকিট কেটে উঠলাম মোটর লাগানো বড়ো নৌকোয়, এতটাই বড়ো যে তাতে সাইকেল, বাইক সব পেরোলো মানুষের সঙ্গে।

ফেরিঘাট থেকে নজরে পরে ইসকনের চন্দ্রদয় মন্দিরের আকাশচুম্বী আকাশী নীল চূড়া। ভাগীরথী আর জলঙ্গী মিশেছে একটু এগিয়ে মোহনায়, গেরুয়ারঙা গঙ্গার ধারা আর ঈষৎ নীলচে জলঙ্গীর ধারা বয়ে চলেছে পাশাপাশি, সঙ্গে ভাসছে প্রচুর পানা, গাছ, অদূরে নবদ্বীপের মহাশ্মশান, নদীর বিশাল বিস্তার আর শীতল হাওয়ায় যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সমস্ত কিছুর মধ্যে এক আশ্চর্য শীতল শান্তির পরশ যেন, তন্ময় হয়ে নদীপথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মিনিট কুড়ি পরে মায়াপুরে এসে নামলাম। নেমে দেখলাম ঘাটের অনতিদূরে ডাব বিক্রি হচ্ছে আর বিক্রি হচ্ছিল কয়েতবেল মাখা, আমরা ডাব খেলাম। তারপর অটো করে

এলাম ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে, খুবই সুশৃঙ্খল, সব কিছু সুন্দর করে সাজানো, প্রচুর দোকান, কিন্তু মন্দির তখন বন্ধ, এদিকে আমাদের ফেরার তাড়া।

তাই উঠে বসলাম কৃষ্ণনগরগামী একটি বাসে, শুনলাম ঘণ্টা খানেক লাগবে পৌঁছতে, বাস কিছুদূর গিয়ে হাইওয়েতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, সেখানে স্ট্যান্ডে মাইক বাজছে, ড্রাইভার, হেল্পার সবাই তার সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করে দিল, এদিকে আমি তো মনে মনে প্রমাদ গুনছি। কিছুক্ষণ ওই নাচ গানের পরে বাস চলতে শুরু করল। কৃষ্ণনগর পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। কৃষ্ণনগর পৌঁছে শুনলাম সন্ধ্যে সাড়ে ছটার আগে কোনো ট্রেন নেই, আমরা টিকিট কেটে নিয়ে প্রথমে একটা টোটো নিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি দেখতে গেলাম, সেখান থেকে আনন্দময়ী কালীমায়ের মন্দির দর্শন করে গেলাম অধরের সরভাজা আর সরপুরিয়ার দোকানে, মিষ্টি কিনে স্টেশনে চলে এলাম।

সংস্কৃতি ও বিদ্যোৎসাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রায়ের নামানুসারে এই স্থান কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত। অতীতে এই জায়গার নাম ছিল রেউই। নদীয়া রাজপরিবারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল কৃষ্ণনগর। তিনি বিদ্বান, সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত, সংগীতরসিক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শাক্তপদাবলী কর্তা রামপ্রসাদ সেন, অন্নদামঙ্গলকাব্য প্রণেতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড় প্রমুখ বাংলার প্রবাদপ্রতিম গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোশক। তাঁর চেষ্টায় এই স্থানে গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ হয় এবং কৃষ্ণনগর বাংলার সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান হয়ে ওঠে। ১৮৫৬ সালে সারস্বত চর্চার কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে কৃষ্ণনগর সাধারণ গ্রন্থাগার। কৃষ্ণনগরের জগদ্বিখ্যাত মৃৎশিল্পের সূত্রপাত ও জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন তার সময়ে তারই উদ্যোগে ঘটেছিল। কৃষ্ণনগর পৌরসভা ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ভারতচন্দ্র রায়, বাঘা যতীন, রামতনু রাহিড়ী, নারায়ণ সান্যাল প্রমুখ বহু গুণীজনের আবির্ভাব ঘটেছে কৃষ্ণনগরে।

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণনগর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার সদর শহর ও পৌরসভা এলাকা। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীর মাটির পুতুল ও মূর্তি পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কুটির শিল্পগুলির অন্যতম। এটি বর্তমানে নদীয়া জেলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রাচীন বাংলার অন্যতম শিক্ষা ও সংস্কৃতির শহর বলে পরিচিত। ঘূর্ণী ক্রিয়াযোগের প্রণেতা শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশায়ের জন্মস্থান, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে ওঁর পৈতৃক ভিটে নদীগর্ভে বিলীন হলে উনি কাশীতে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে রিকশায় আনন্দময়ী রোড ধরে মিনিট-কুড়ি গেলে রাস্তার পাশেই আনন্দময়ী কালীমাতার মন্দির। সামান্য দূরেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি। দেবীর নামেই মন্দির সংলগ্ন এলাকার নাম আনন্দময়ীতলা। সুদৃশ্য আলগোছ বা একরত্ন মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর। মন্দিরে রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের নাম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খোদাই করা আছে। ছবিও আছে তাঁর। সেবাইত হিসেবে নামোল্লেখ আছে শ্রী সৌমীশচন্দ্র রায়ের। শোনা যায় গিরিশচন্দ্র রায় তন্ত্রসাধকও ছিলেন।

মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮০৪ সালে। গিরিশচন্দ্র রাজা হওয়ার দুবছর পর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নির্মাণরীতি অনুসরণ করেননি। মন্দিরের ছাদ কাঠের কড়ি বরগায় তৈরি। গর্ভগৃহের সামনেই পাঁচ খিলানযুক্ত বারান্দা। সমতল ছাদ দালানের উপর চারচালা শিখরযুক্ত মন্দিরে আছে সামান্য পঙ্খের অলংকরণ। দক্ষিণমুখী আনন্দময়ী মন্দিরটি সাধারণ দোতলা বাড়ির থেকে সামান্য উঁচু। মন্দিরের চূড়ায় রয়েছে তিনটি ধাতুনির্মিত ফলক। মন্দিরটির শিল্পশৈলী আদিম ও প্রাচীন।

চারদিক প্রাচীরে ঘেরা। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলেই মন্দিরঅঙ্গন। এর ডানপাশে মা অন্নপূর্ণা ও গৌরাঙ্গদেবের মন্দির। অঙ্গনের বাঁদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে দোতলায় আনন্দময় শিব মন্দির। ঠিক এর নিচের তলায় সিংহাসনে হাত পা মেলে নাড়ু নিয়ে বসে আছেন গোপাল বিগ্রহ।

এবার গর্ভমন্দিরের কথা। পঞ্চমুন্ডের আসনের উপর পাথরের বেদীতে হাঁটু মুড়ে যোগাসনে শুয়ে আছেন মহাদেব। শ্বেতপাথর নির্মিত বিগ্রহ। পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত। মহাদেবের বুকের উপরে পদ্মাসনে বসে আছেন দেবী আনন্দময়ী। কষ্টিপাথরে নির্মিত নয়নাভিরাম বিগ্রহ উচ্চতায় সাড়ে ৩ ফুটের কাছাকাছি, দেবী চতুর্ভুজা। সোজাসুজি তাকালে বেদির ডানপাশে আছে ছোট্ট একটি কালীমূর্তি। এছাড়াও মন্দির অলংকৃত দেবী শীতলা ও অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহে।

BANGLADARSHAN.COM

লোকশ্রুতি আছে, দেবী আনন্দময়ীর ধ্যানরতা মূর্তিতে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে ওই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন রাজা গিরিশচন্দ্রকে। দেবী মূর্তিটি আজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানেই নাকি পাওয়া গিয়েছিল প্রকাণ্ড একটি কষ্টিপাথর। যে পাথরে নির্মিত হয়েছে মহারাজের স্বপ্নে দেখা বিগ্রহ। শিলাখণ্ড থেকে মূর্তি নির্মাণ করা হয় দুটি। একটি আনন্দময়ী কালী, আর একটি ভবতারিণী কালী।

ভবতারিণী কালী নবদ্বীপ ধামে পোড়ামাতলায় নিত্যপুজো পেয়ে চলেছেন আজও। আনন্দময়ীর পুজো হয় কালীর ধ্যানে। আনন্দময়ী এবং ভবতারিণী দুটি ক্ষেত্রেই দেবীর পুজোতে মাছ ভোগ দিতে হয়।

পোড়ামা কালীমন্দির পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপ শহরে অবস্থিত একটি প্রাচীন কালী মন্দির।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌম নামক এক পণ্ডিত নবদ্বীপ শহরের এক বটবৃক্ষতলে দক্ষিণাকালীর ঘট স্থাপন করেন। কোন এক সময়ে বটগাছটি অগ্নিদগ্ধ হলে এই কালী পোড়ামা নামে জনপ্রিয় হন।

অন্য মতে, বাসুদেব সার্বভৌম এর বহু পূর্বে জনৈক রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ (কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের 'রামভদ্রি' টীকাকার) দক্ষিণাকালীর সাধক ছিলেন। গোপাল মন্ত্রে সিদ্ধ অন্য এক পণ্ডিতের সঙ্গে তার শাস্ত্রীয় বিচার হয়। পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ীর মন্ত্রশিষ্য হবেন, উভয়ে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ, পরাজিত হয়ে প্রতিজ্ঞা মতো তার ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করতে উদ্যত হলে, ভয়ানক অগ্নিকান্ডে তার ইঁটের বাড়ি ভস্মীভূত হতে থাকে এবং মন্দিরের মধ্যে দেবীর করালমূর্তি তার দর্শনগোচর হয়, দেবীর কোলে গোপাল উপবিষ্ট। মন্ত্রশোধিত জল ছড়িয়ে আগুন নিভলে সাধক নিজে বেঁচে যান এবং তার মন্দিরে দু'খানি মাত্র ইঁট অবশিষ্ট থাকে। এই ইঁট

দুখানা আজও পোড়া-মার আধার হয়ে রয়েছে এবং তার উপরেই ঘটস্থাপন করে পূজা হয়। অনেকে মা পোড়া মাকে নীল সরস্বতীও বলে থাকেন।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র গিরিশচন্দ্র দেবী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কষ্টিপাথরে নির্মিত কালীবিগ্রহ আসন করে শায়িত শিবের ওপর উপবিষ্টা। এই মন্দিরের কাছেই ভবতারণ শিব এবং ভবতারিণী কালী মন্দির আছে। সময়াভাবে আমরা পোড়া মা তলা যেতে পারিনি।

কৃষ্ণনগর স্টেশনে ঢুকে দেখি লালগোলা প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে, আর তাতে বীভৎস ঠাসা ভীড়, যারা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল উঠবে বলে ওই ভীড়ের জন্যে উঠতে পারল না। আমার বেশ চিন্তা হচ্ছিল। শুনলাম সেদিন শেষ তিন ঘণ্টায় কোনো ট্রেন আসেনি বলে এই অবস্থা। আমরা একটু ভীড় বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি একটি বছর তিরিশের যুবক হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, হঠাৎই সে এগিয়ে এসে আমাদের সাথে আলাপ করল। শুনলাম তার নাম আশিস শর্মা, একজন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, আদতে দিল্লীর বাসিন্দা কিন্তু শেষ দুবছরে পায়ে হেঁটে সতেরো হাজার কিলোমিটার ঘুরেছে ভারতবর্ষের শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসন, শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য, কৃষ্ণনগরে এসে দেখা করে এসেছে কৃষ্ণনগর কলেজের ভারতের প্রথম কিন্নর অধ্যক্ষা মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। ওখানে সেমিনার করেছে ছাত্রছাত্রীদের ও অধ্যাপকদের সাথে ওই শিশু শ্রমিকদের উন্নয়নের ব্যাপারে, এখন কলকাতায় যাবে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর ওখানে পরেরদিন কনফারেন্সে যোগ দিতে। আমাদের সঙ্গে কথা বলবার মাঝখানে ট্রেন আসার ঘোষণা হল। আমরা প্রস্তুতি নিলাম ট্রেনে ওঠার।

BANGLADARSHAN.COM

ট্রেন ঢোকার পরে দেখলাম আমাদের সামনের কামরাটাই লেডিস কোচ, আমরা উঠলাম, বসার জায়গাও পেলাম। ঘণ্টা খানেক পরে মেয়ের বাবা ফোন করল, তাঁকে বলতে পারছিনা আমরা বাইরে আছি, সে তো জানেই না আমাদের এই বেড়ানোর কথা। আর সে অস্থির হয়ে যাচ্ছে আমরা কেন রাস্তায়, কারণ রাস্তার আওয়াজ পাচ্ছে সে। যাইহোক, অনেকভাবে বুঝিয়ে তাঁকে শেষে রাত সাড়ে নটায় আমরা শিয়ালদা পৌঁছলাম, ওখান থেকে বজবজ লোকাল ধরে নিউ আলিপুর স্টেশনে নামলাম রাত্রি দশটা পনের, সেখান থেকে অটো ধরে বেহালায় নামলাম পৌনে এগারোটায়। খুবই কষ্ট হয়েছিল একদিনে ঘুরে আসতে কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাদের টেনে নিয়ে গেছে আবার আগলে আগলে ফিরিয়েও এনেছে নিরাপদে। জয় মহাপ্রভু, জয় গুরু।

“আজো সেথা নিত্যলীলা করেন গোরা রায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥”

–চৈতন্য চরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

পাতাল সাধুর আশ্রম

সোনার গৌরাঙ্গ

ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দির

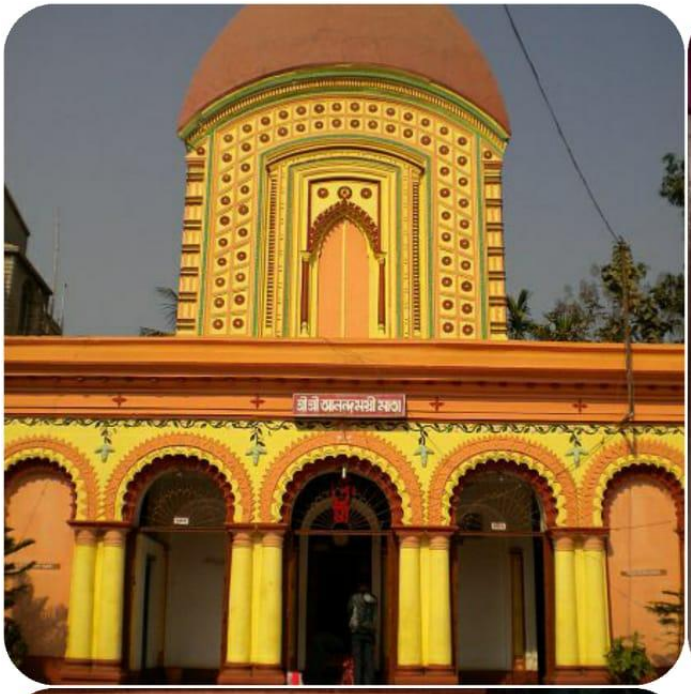

কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালী মন্দির
আর তার শিবলিঙ্গ

ভাগীরথী আর জলঙ্গি

কৃষ্ণনগর রাজবা

নবদ্বীপের পোড়ামা

দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

কেশবজি গৌড়ীয় মঠ

নবদ্বীপ ধাম
নবদ্বীপ ধাম NABADWIP DHA
BIRTH PLACE OF SHREE CHAITANYA

পাট শুকোচ্ছে

॥তারাক্ষেত্রে তারাপীঠে॥

দেবী দুর্গার আভা মণ্ডলে উপরোক্ত দশ মহাবিদ্যার দশ প্রকার শক্তির প্রতিক। সৃষ্টির ক্রমে চার যুগেই অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি, এই দশ মহাবিদ্যা বিরাজমানা। এর সাধনা মাত্রই ফলদায়ক এবং সাধকের সমস্ত কামনা পূরণকারী। মা পরমাপ্রকৃতির রূপ বর্ণনায় দশমহাবিদ্যা স্তোত্রটি হল:

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়োশী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা
এত দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতাঃ॥

ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে বিভিন্ন প্রজাপতির অধিপতি করে দিলেন। এতে গর্ভিত হয়ে দক্ষ প্রজাপতি বৃহস্পতি নামে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। কেবল মহাদেব এবং কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে নিমন্ত্রণ করেননি। শিব ছিলেন দক্ষের জামাতা। সতী এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের খবর জানতে পেরে বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে যাওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি চান। কিন্তু অনুমতি না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর ক্ষমতা দেখানোর স্বমূর্তি ত্যাগ করে শিবের ভয় উৎপাদন করার জন্য দেবী ভগবতী দশদিকে দশমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে মহাদেবের পথ অবরুদ্ধ করেন। এই দশ মূর্তিকে দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাত।

BANGLADARSHAN.COM

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাংলা কাব্যে ও কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, মৎস্য পুরাণ-সহ বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে, সতীর দেহত্যাগে মহাদেব বিলাপ করতে করতে অচেতন হয়ে পড়েন। তখন নারদ এসে বীণা বাজালে শিবের জ্ঞান ফেরে। শিব বলেন যে, তিনি অচেতন অবস্থায় এতক্ষণ সতীকে দর্শন করছিলেন। সতী কোথায়, নারদ জানতে চাইলে মহাদেব মহাকালের মধ্যে সিংহ, কন্যা, তুলা প্রভৃতি দশটি রাশির দশটি মহাপুরিতে দশ মহাবিদ্যার অবস্থান দেখিয়ে দেন এবং মহাবিদ্যার তত্ত্ব কথার রহস্য বুঝিয়ে দেন।

দ্বিতীয় মহাবিদ্যা মা তারা স্বয়ং কৈবল্যদায়িনী, মোক্ষদাত্রী, একান্ত শরণাগত হয়ে মায়ের কাছে যা চাওয়া যায়, মা তাই দেন। ত্রিভুবনে বিরাজিতা মা তারা ত্রিতাপনাশিনী, তিনি সগুণা, আবার তিনি নির্গুণা, তিনি সাকারা, আবার নীলজ্যোতির্বলয়ে তিনি নিরাকারা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁরই করুণাধারা, তিনি অভয়দায়িনী, মা বলে যে ডাকে, তাকে চরণে স্থান দেন। ত্রিলোকেশ্বরী মা তারা ত্রিনয়নী, চৈতন্যের প্রেমে তিনি অচেতনকে ত্যাগ করেন, তিনিই শুচি, তিনি অশুচি, তিনি পাপ, তিনি পুণ্য, তিনিই ভক্তি, মুক্তি, ধর্মাধর্ম। তারাপীঠ পুণ্যক্ষেত্র, মা তারা সেখানে নিয়তই নিজের লীলা করে চলেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যিনি আপন উদরে রেখেছেন, তিনি সন্তানের কামনা পূরণে সদা তৎপর। মা তারার কাছে কোনও কিছুই অসাধ্য নয়। তিনিই সময় মতন সব কিছু দেন। দু'হাত ভরে, তিনিই সন্তানের সমস্ত ব্যথা ও যন্ত্রণার উপশম করেন। পুরাণ মতে, মা তারার আবির্ভাব ঘটেছিল সমুদ্র মন্থনের সময়। সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে আসা হলাহল পান করে মহাদেব অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়

মা পার্বতী, তারা মায়ের রূপে সেখানে আবির্ভূত হয়ে দেবাদিদেবকে দুধ পান করান, মুহূর্তে ফিরে আসে শিব ঠাকুরের জ্ঞান। সেই থেকেই মায়ের এই বিশেষ রূপের আরাধনা হয়ে আসছে। মায়ের শিলা মূর্তিতে এই রূপেরই দর্শন হয়।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় রূপ হল তারা। তারার ভৈরব অক্ষোভ্য। ভীষণ দর্শনা কালীর ভয়ে মহাদেব ভীত হলে সতী দ্বিতীয় বার আবির্ভূত হন তারা রূপে। তাঁর গায়ের রং নীল, নব যৌবনা, পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম। দেবীর চারটি হাত। দেবীর অবস্থান প্রজ্জলিত চিতার মধ্যে। তাঁর বাম পা শিবের বুকে অবস্থিত। তন্ত্রশাস্ত্রে ইনি মহানীল সরস্বতী। মা তারা বামাবর্তিনী ও বিপরীতরতাতুরা। সাধক কবির ভাষায়,

ওই শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত-শোভিত,
তড়িতজড়িত নবঘন ঝলকে, ওই শ্যামা বামা কে?

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় রয়েছে একান্ন সতীপীঠের মধ্যে ছটি সতীপীঠ আর একটি সিদ্ধ পীঠ। সতীপীঠগুলি হল ফুল্লরা, অট্টহাস, নলহাটি, বক্রেশ্বর, নন্দীকেশ্বরী আর কঙ্কালীতলা আর সিদ্ধপীঠ হল তারাপীঠ। তারামায়ের আশীর্বাদ আছে যে এই কলিযুগে এগারো লক্ষ সাধক সিদ্ধিলাভ করবে তারাপীঠে। তাঁদের মধ্যে আপ্তকাম সাধকদের কয়েকজন আমাদের পরিচিত, যেমন ডাবুকের কৈলাশপতি বাবা যিনি বামাক্ষেপার গুরু, বামাক্ষেপা, তারা ক্ষেপা, স্বামী নিগমানন্দ, রাঙা মা যিনি মা তারারই এক সত্তা ছিলেন, তন্ত্রসাধক সুদীনবাবা, শঙ্করবাবা, জ্ঞানানন্দ তীর্থ অবধূত প্রভৃতি আর তারা মায়ের কাছে এসে তন্ত্র সাধনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কলকাতার কসবার আদ্যা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত যিনি আদ্যা মা তিনি এই জ্ঞানানন্দ তীর্থ অবধূতের ধ্যান মূর্তি। এই মায়ের কাছেও চাইলে চতুর্বর্গ ফল দান করেন। সুদীন বাবা, যিনি মাতৃ সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আদ্যাপীঠের সংঘগুরু ছিলেন, তাঁর পঞ্চমুন্ডির আসন, ত্রিশূল এবং তান্ত্রিক পূজার ব্যবহৃত সব সামগ্রী তারাপীঠের একটি আশ্রমে সুরক্ষিত রয়েছে আজও।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা,
মা ত্বং হি তারা।
আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা, মা ত্বং হি তারা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা মা ত্বং হি তারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা অকুলের প্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা।

মা ত্বং হি তারা॥

—কাজী নজরুল ইসলাম।

সময়টা ১৯৭৪-৭৫ সাল, আমার বাবার কর্মসূত্রে আমরা তখন থাকি শিল্পনগরী দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরেই আমার এক কাকা থাকতেন, তখনো তিনি অবিবাহিত, একবার তিনি আমাদের সপরিবারে সঙ্গে নিয়ে যান শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা দেখাতে। সেবার আমরা দুর্গাপুর থেকে অ্যাম্বাসেডর গাড়ি ভাড়া করে মাঝরাত্রে দুর্গাপুর থেকে বেরিয়ে পৌষমেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছই ভোর পাঁচটায়। সকালে ছাতিমতলায় ব্রাহ্ম উৎসবে ব্রহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত শুনে উৎসবে যোগদান করে শান্তিনিকেতনের কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে সারাদিন মেলায় ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় ফেরার সময় কাকা বলেন, “কাছেই তারাপীঠ, চল দর্শন করে ফিরি।” সেইমতো কিছুটা যাওয়ার পরে ইলামবাজারে বড়ো জঙ্গলের মাঝে যখন গাড়ি, তখন গাড়ির টায়ার বার্স্ট করে, সঙ্গের স্টেপনীটিও দেখা যায় ঠিক নেই, ফলে সারারাত ডিসেম্বরের ঠান্ডায় আর ডাকাতের হাতে প্রাণ খোয়ানোর ভয়ে জেগে আমাদের গাড়ির মধ্যে কাটাতে হয়। সেই সময়ে ইলামবাজারের ওই জঙ্গল কুখ্যাত ছিল ডাকাতির জন্যে। এরপরে আরো সাতবার আমরা শান্তিনিকেতন গেছি অন্য আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে, কিন্তু যতবার তারাপীঠ যাবার কথা হয়ে আমরা তারাপীঠে যাবার চেষ্টা করেছি কোনো না কোনো ভাবে ভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। আমার মায়ের জীবদ্দশায় তাঁর তারা মাকে দর্শন আর করা হয়নি।

BANGLADARSHAN.COM

এরপর বিভিন্ন জায়গায় তারা মায়ের কথা, তারা সাধনার কথা, অনেক মহাত্মার তারা মায়ের কৃপা লাভের কথা শুনেছি, দেখেছি কিন্তু যাওয়া হয়নি। ২০০৪-এ “তারাপীঠ ভৈরব” বইটা পড়ার সুযোগ হল, সাধক বামাক্ষ্যাপার কথা, তাঁর যোগ বিভূতির কথা এবং তারামায়ের আশ্চর্য লীলার কথা জানলাম, বইটা কিনেছিলাম ট্রেনে। কিন্তু যাওয়া হল না তখন। বুঝলাম তারা মা আমাকে টানেননি।

২০০৯-এর শেষের দিকে হঠাৎ ঠিক হল ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের তারাপীঠ দর্শন হবে। টিকিটের রেজারভেশন হল রামপুরহাট এক্সপ্রেসে। যাত্রার দিন শনিবার সকাল। বুধবার রাত্রি থেকে আমার গ্যাস্ট্রাইটিসের সাংঘাতিক সমস্যায় শরীর বেশ খারাপ হল। বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার আমি একদম চুন চিনির জলের ওপরে কাটালাম, শুক্রবার রাত্রে কর্তা বললেন যে শরীর বেশি খারাপ হলে বলতে, যাওয়া ক্যানসেল করবে, আমি আশ্বস্ত করলাম। সারারাত পেটের ব্যথায় ঘুমোতে পারলাম না, পরের দিন রাত থাকতেই উঠে তৈরী হয়ে হাওড়া স্টেশনে। ট্রেনে উঠেও বেশ শরীর খারাপ লাগছে। ট্রেন চলতে শুরু করলো, তারামাকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম। যখন বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে, বুঝলাম খুব খিদে পেয়েছে, সামনে লুচি-তরকারি বাক্সয় করে বিক্রি হচ্ছিল, কিনলাম এবং খেলাম। মেয়ে আর তার বাবা অনেক বারণ করল, আমি বললাম যে কিচ্ছু হবে না। এতোক্ষনে অনুভব করে ফেলেছি যে পুরোটাই মায়ের পরীক্ষা ছিল।

আমরা বেলা দশটায় রামপুরহাট পৌঁছে অটো নিয়ে পৌনে এগারোটায় তারাপীঠ পৌঁছে যাওয়া হল। আসার সময় আদিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতির উন্মুক্ত রূপ, ধানক্ষেত আর তার মধ্য দিয়ে পিচঢাকা পথ দেখে মন ভরে গেল।

তারাপীঠে পৌঁছে প্রথমে হোটেল ঠিক করা হল, নিউ বিদেশিনী হোটেল পছন্দ হল, হোটেলে আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়ালে বিরাট পুকুর যেখানে রাজহাঁস, পাতিহাঁস আর পানকৌড়ির আনাগোনা, রাস্তার ওপরে এই হোটেল, হোটেলের ঘরের বারান্দা থেকে মায়ের মন্দিরের চূড়া দেখা যায় আর মায়ের সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসে। জিনিসপত্র রেখে ছুটলাম মন্দিরে, মন্দির দুপুরের ভোগের জন্যে বন্ধ হবে, তার আগে একজন পান্ডা হঠাৎই লোক দিয়ে মায়ের দর্শন করিয়ে দিলেন। দর্শন করলাম জীবিৎ কুন্ড যেখানে কাটা শোল মাছের টুকরো জোড়া লেগে জলে চলে গেছিল আর বণিক জয়দত্তর মৃত ছেলে এই জলেই নামিয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। তারাপীঠের মাটি, মন্দির, মহাশ্মশান তারা মায়ের লীলাভূমি। দর্শন সেরে গেলাম তারাপীঠের বিখ্যাত মহাশ্মশান দেখতে, পুরো ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত শ্মশানের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে দ্বারকা নদী, যেখানে প্রতি বাইশ বছর অন্তর বন্যা হয়। গিয়ে দেখলাম একটি চিতাতে দাহকার্য চলছে, কিন্তু তার মধ্যে দেহটি যেন উঠে বসছে। মেয়ে তখন ছোট, দেখে বেশ ভয় পেল, বেরোনোর সময় ওর পায়ে একটি মাংসের হাড় ফুটে গেল। শ্মশানে মায়ের ভোগের একটা অংশ শিবা বা শিয়ালদের বরাদ্দ, শ্বেত শৃগাল এসে ভোগ গ্রহণ করে রাত্রে, তাদেরই অভুক্ত মাংসের হাড়ের টুকরো সেটি, এইরকম প্রচুর হাড় শ্মশানে ইতস্তত ছড়ানো। দ্বারকা নদীর তীরে এই মহাশ্মশান, যেখানে প্রতিঅমাবস্যায় নানা তান্ত্রিক ক্রিয়া কর্মের কৌলচক্র বসে। স্থানীয় লোকেরা বললেন যে এখনও তারাপীঠের শ্মশানে রাত্রে এসে ক্রিয়া করে ভোরে ফিরে যান বহু তান্ত্রিক ও সাধক। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বহু জ্যোতিষী তাঁদের তান্ত্রিকক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে তারাপীঠের শ্মশানকেই বেছে নেন কারণ এটি সিদ্ধক্ষেত্র। ওখান থেকে একটু এগিয়ে মায়ের চরণপদ্ম যেখানে আলতা, সিঁদুর দিয়ে আমরা বেরোলাম। আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরলাম। সন্ধ্যেবেলায় আবার গেলাম মন্দিরে, সেদিন একদিনে পাঁচবার মায়ের দর্শন হয়েছিল, যার মধ্যে ওখানকার সেবায়েত আমার মাথা মায়ের বুকে ছুঁইয়ে দেয়, যাতে আমার এমন অনুভূতি হয় যেন শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল আর আমি অঝোরে কাঁদতে থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

তারাপীঠের মন্দিরের রাস্তার দুপাশে হরেক জিনিসের দোকান, কিন্তু হোটেলগুলো আর নানান আশ্রম বাদ দিলে বেশিরভাগ দোকান মিষ্টির, তারাপীঠের মিষ্টি বিশেষত রসগোল্লা আর ল্যাংচা বিখ্যাত, আমরা কৌটোয় ভরে বাড়িতেও এনেছি বহুবার। আর ওখানে পাওয়া যায় দেওঘরের ক্ষীরের প্যাড়া।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারা, মহাবিদ্যাগণ প্রকৃতিগত ভাবে তান্ত্রিক। মা তারা পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকারিণী (তারিণী) দেবী। বিশ্বের উৎস হিরণ্যগর্ভের শক্তি এবং মহাশূন্যের প্রতিক। তারা ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্টদেব দ্বারা জাগ্রতা ও আরাধিতা হয়ে প্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিতা হন আর সেই সঙ্গে জাগ্রত হয়ে ওঠে মহাপীঠ তারাপীঠ।

কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী॥ ১
তারকত্বাৎ সদাতারা তারিণী চ প্রকীর্তিতা॥ ২
শ্রীদাত্রী চ সদা বিদ্যা ষোড়শী পরিকীর্তিতা॥ ৩

ভৈরবী দুঃখহন্ত্রী চ যমদুঃখ বিনাশিনী॥ ৪
ভুবনানাং পালকত্বাৎ ভুবনেশী প্রকীর্তিতা॥ ৫
ত্রিশক্তি কালদা দেবী ছিন্না চৈব সুরেশ্বরী॥ ৬
ধূমরূপা মহাদেবী চতুর্বগপ্রদায়িনী॥ ৭
ব-কারে বারুণীদেবী গ-কারে সিদ্ধিস্মৃতা॥ ৮
ল-কারে পৃথিবী চৈব চৈতন্য মে প্রকীর্তিতা॥ ৯
সর্বাপত্তারিনী দেবী মাতঙ্গী করুণাময়ী॥ ১০
বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা ধনদায়িনী॥ ১১
এতেঃ দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতঃ॥

ইনি জীবকে বাকশক্তি প্রদান করেন, তাই এঁর নাম নীল সরস্বতী, সকল জীবকে উদ্ধার-তারণ করে, তাই ইনি তারিণী তারা। এঁর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে কালরাত্রির দিনে স্বয়ং উগ্র আপদ থেকে জীবকে তারণ করেন, তাই ইনি উগ্রতারা। মেরুর পশ্চিমকূলে চোল বলে এক হ্রদে মায়ের আবির্ভাব। ত্রিযুগ ধরে ইনি সেখানে তপস্যা করেন, বলরামপ্রপূজিতা, তারা সত্বগুণাত্মিকা তত্ত্ববিদ্যাদায়িনী।

তন্ত্রমতে-তাঁর ধ্যান–

BANGLADARSHAN.COM

“প্রত্যালীড় পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা কটৌ।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।
খড়্গ কর্ত্রী সমাযুক্ত সব্যেতর ভুজদ্বয়াম্।
কপাল উৎপল সংযুক্ত সব্যপানিদ্বয়ান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটা ধ্যায়েৎ।
মৌলী অক্ষোভ্য-ভূষিতাম্।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাম্ ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং।
সাবেশস্মের বদনাং স্ত্র্যলঙ্কারভূষিতাম।
বিশ্বব্যাপক তোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
অক্ষোভ্য দেবীমূর্ধণ্যস্ত্রিমূর্তি নাগরূপধৃক॥”

তন্ত্রসারে দেবী তারার যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

তারা প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ শববক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপিতা। ভয়ংকরী, মুণ্ডমালাভূষিতা, খর্বা, ভীষণা, লম্বোদরী, কটিতে ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা, নবযৌবনা, পঞ্চমুদ্রা শোভিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরদা, খড়্গ কাতরি

দক্ষিণহস্তে ধৃতা, বামহস্তদ্বয়ে কপাল ও নীলপদ্ম, পিঙ্গলবর্ণ একজটাধারিণী, ললাটে অক্ষোভ্য প্রভাতসূর্যের মতো গোলাকার তিন নয়নশোভা, প্রজ্জ্বলিত চিতামধ্যে অবস্থিতা, ভীষণদন্তা, করালবদনা, নিজের আবেশে হাস্যমুখী, বিশ্বব্যাপ্ত জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মের উপর অবস্থিতা।

তন্ত্রসারে তারার আরও একটি ধ্যানমন্ত্র বর্ণিত হয়েছে: "শ্যামবর্ণা ত্রিনয়না দ্বিভূজা, বরমুদ্রা ও পদ্মধারিণী, চতুর্দিকে বহুবর্ণা ও বহুরূপা শক্তির দ্বারা বেষ্টিতা, হাস্যমুখী মুক্তাভূষিতা, রত্নপাদুকায় পাদদ্বয় স্থাপনকারিণী তারাকে ধ্যান করবে।" বৃহদ্ধর্ম পুরাণে তারাকে কেবল শ্যামবর্ণা ও কালরূপিণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্ত্রসারে তারাকেই মহানীল সরস্বতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতচন্দ্র রায় তার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তারার যে রূপ বর্ণনা করেছেন, তা নিম্নরূপ:

তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবরণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীল পদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥

BANGLADARSHAN.COM

তারাপীঠের ব্রহ্মশিলায় খোদিত তারামূর্তিটি দ্বিভূজা, সর্পযজ্ঞোপবীতে ভূষিতা এবং তার বাম কোলে পুত্ররূপী শিব শায়িত। তারামায়ের আটটি রূপ, সেগুলি হল–তারা (বামাকালী), উগ্রতারা, নীলসরস্বতী, একজটাতারা, তারিণীতারা, নিত্যাতারা, বজ্রাতারা, কামেশ্বরীতারা। বৌদ্ধধর্মেও তারা দেবীর পূজা প্রচলিত। তারার মূর্তিকল্পনা কালী অপেক্ষাও প্রাচীনতর। তিনি দেবী পার্বতীর এক উগ্র রূপ। বিখ্যাত তারা সাধক বামাক্ষ্যাপা হলেন বশিষ্ট দেবেরই সত্তা। বামাক্ষেপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন, একই পরমপুরুষ সত্তার তিনটি ভিন্ন রূপ এবং এঁদের আবির্ভাব কালও প্রায় সমসাময়িক। এটি জ্ঞাত হয় আমার সদ্গুরু, যিনি নিজেও আপ্তকাম সাধিকা তাঁর কাছ থেকে।

মা তারা শত্রুহন্তা, সৌন্দর্য এবং রূপ-ঐশ্বর্যের দেবী। মা তারা আর্থিক উন্নতি, ভোগ, দান এবং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য প্রসিদ্ধ। মা তারার তিনটে স্বরূপ। তারা, একজটা এবং নীল সরস্বতী। চৈত্র মাসের নবমী তিথি এবং শুক্ল পক্ষের দিন তারা রূপী দেবীর পুজো, তন্ত্র সাধকদের জন্য সর্বসিদ্ধিকারক। তারা মহাবিদ্যার কৃপার ফলে ব্যক্তি এই সংসারে ব্যবসা, রোজগার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ বিখ্যাত ব্যক্তি হতে পারে।

পরেরদিন মাঝরাত্রে উঠে আমরা তৈরী হলাম মায়ের শিলামূর্তি দর্শনাভিলাষে, মেয়ে যেহেতু বেশ ছোট, কিছুতেই ওঠে না, শেষে ওর বাবা প্রচুর বকুনি দেওয়াতে উঠে তৈরী হল। মন্দিরে গিয়ে মায়ের শিলামূর্তি দর্শন হল আর পুজো দেওয়া হল। একমাত্র ভোরবেলাতেই এই শিলামূর্তি দেখা যায়। মায়ের শিলামূর্তি দর্শন করে

পুজো দিয়ে ফিরে এলাম আমরা প্রায় পাঁচটা, একটু বিশ্রাম নিয়ে জলখাবার খাব বলে নিচে নেমেছি আমি একা, একজন এসে বলল যে আশে পাশের আরো চার পাঁচটি জায়গা দর্শন করিয়ে দেবেন, যাব কিনা। ঘরে এসে মেয়ের বাবাকে বলতে সেও রাজি।

আমরা বেরোলাম সকাল আটটা নাগাদ, আমাদের গাড়িতে ড্রাইভার ছেলেটি ছাড়া আমরা তিনজন। প্রথম গেলাম নলহাটি, তারাপীঠ থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে এসে বেশ কিছুটা গেলে নলহাটি, রামপুরহাট থেকে দুটো জায়গাই কাছাকাছি। সতী পীঠের এক পীঠ এই নলহাটি যেখানে পূজিতা মা নলাটেশ্বরী। এখানে মায়ের গলার নলী পড়েছিল, ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত নলহাটি শহরের মধ্যে একটি ছোট পাহাড়ের ওপরে নলহাটেশ্বরী মন্দির আর একটু দূরে আনা বাবার মাজার শরীফ, যা ওই লালমাটির দেশের দুটি দর্শনীয় স্থান।

সেখানে পুজো দিয়ে সেখান থেকে বক্রেশ্বর এলাম। যেখানে উষ্ণ প্রস্রবণ বিখ্যাত আর আছেন মা মহিষমর্দিনী আর তাঁর ভৈরব বাবা বক্রেশ্বর, এটিও একটি শক্তিপীঠ একান্ন পীঠের। সত্যযুগে ঋষি অষ্টাবক্র এখানে সাধনা করে শিবের বরে নিজের শরীরের আটটি বক্রতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আর এই বক্রতা মুক্ত করেছিলেন তাই শিবের নাম এখানে বক্রেশ্বর অর্থাৎ যিনি বক্রতা থেকে মুক্তিদান করেন। দশটি উষ্ণ প্রস্রবণ এখানে আছে, পাপহরা গঙ্গা, বৈতরিণী গঙ্গা, খুর কুণ্ড (যেখানে জলের তাপমাত্রা ৬৬°), ভৈরব কুণ্ড (যেখানে জলের তাপমাত্রা ৬৫°), অগ্নিকুণ্ড (যেখানে জলের তাপমাত্রা ৪০° আর যেখানকার জল ঔষধি গুণ সম্পন্ন কারণ জলে বিভিন্ন খনিজ লবণের উপস্থিতি যাতে অনেক অসুখ সারে), দুধ কুণ্ড (কারণ প্রতিদিন সকালে এখানকার জল দুধের মতো সাদা হয়ে থাকে, আস্তে আস্তে বেলা বাড়লে জল স্বাভাবিক হয়, খুব সম্ভবত সকালের দিকে বাতাসে ওজনের আধিক্য হেতু ওই সাদা রং হয় ওই বাড়ি জলের তাপমাত্রা ৬৬°), সূর্য কুণ্ড (জলের তাপমাত্র ৬১°), শ্বেত গঙ্গা, ব্রহ্ম কুণ্ড আর অমৃত কুণ্ড। সতীর দুই ভ্রু-র মধ্যস্থল বা মন পড়েছিল বক্রেশ্বরে। রেখ-দেউলরীতির স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি বক্রেশ্বর দুধসাদা সুউচ্চ শিব মন্দিরের ঠিক দক্ষিণ দিকে দেবী মহিষমর্দিনী মন্দির। মন্দিরের বেদীতে অধিষ্ঠিত পিতলের তৈরি দশভূজা দুর্গা মূর্তি। প্রচলিত বিশ্বাস ও শতাব্দী প্রাচীন ধারণা প্রতিষ্ঠিত পিতলের দশভূজা মূর্তির নিচেই একটি গর্তের মধ্যে রয়েছে সতীর দেহাংশ-মন। বীরভূমের পাপহরা নদীর তীরে বক্রেশ্বরের অবস্থান। বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করলাম, কিন্তু প্রস্রবণের জল বেশ অপরিষ্কার আর যদিও ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য আলাদা স্নানের জায়গা আছে, কিন্তু যেখানে জামাকাপড় পাল্টানোর জায়গায়, সেই বাথরুমগুলি ভীষণ নোংরা, দরজার ছিটকিনি নেই। সব দেখে খুবই বিরক্ত হলাম। স্নান সেরে মা মহিষমর্দিনীকে ও বক্রেশ্বর শিবকে পুজো দিলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে স্থানীয় একটি দোকানে দুপুরের খাবার খেতে ঢুকলাম, কিন্তু দোকানে মাছির উৎপাতে খেতে পারলাম না।

বোলপুর যাবার রাস্তায় সিউড়ির কাছে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপরে পড়ে তিলপাড়া ব্যারেজ, সেখানে আমরা নেমে, দেখে সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। নদীর ওই নিশ্চুপ স্নিগ্ধ রূপটা আজও মনে দোলা দেয়, একেবারে "শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি।" ব্যারাজের লকগেটের ওপরে দেখলাম অনেক পানকৌড়ি, বালিহাঁস, বক, অন্য পাখি বসে রোদ পোহাচ্ছে। নদীর অনেকখানি বিস্তার কিন্তু যেহেতু শীতকাল তাই জলের ধারা স্তিমিত।

BANGLADARSHAN.COM

এই রাস্তাতেই পড়ল সেই ইলামবাজারের শাল-মহুয়ার বিস্তীর্ণ জঙ্গল যা এখন অনেকটাই ছোট আর শুনলাম সেই ডাকাতের ভয়ও আর নেই। নির্জন দুপুরে ওই জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওই একটুকরো সবুজের সমারোহ চোখে আরাম দেয়। রাস্তার দুপাশে ছড়ানো কাশফুলের বন, সেখান থেকে গাড়ি থামিয়ে মেয়ে কাশফুল সংগ্রহ করল। যেতে যেতে বীরভূমের লালমাটির রাস্তায় নানান বাউলদের দেখে ভাবছিলাম ট্রেনে এমনি এক অখ্যাত বাউল আমায় শুনিয়েছেন, "তোমায় হৃদমাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না।"

এরপর গেলাম বোলপুরের কঙ্কালীতলা। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর-লাভপুর রোডের পাশে এই শক্তিপীঠ অবস্থিত। দক্ষযজ্ঞের পর এখানে দেবী সতীর কঙ্কাল বা কাঁকাল পড়েছিল। এখানে দেবীর নাম দেবগর্ভা ও ভৈরব রুরু। কঙ্কালীতলা মন্দিরের পাশে একটি কুণ্ড আছে। এতে কিছু পাথর আছে। অনেকে এগুলোকে দেবীর দেহাংশ বলেন। ২০ বছর পর এই পাথরগুলো তোলা হয়। পূজা শেষ হলে তা আগের জায়গায় রেখে দেয়া হয়। পাশের শ্মশানে গুপ্ত তন্ত্র সাধনা হয়। এখানেও আমরা পুজো দিয়ে একটু বসলাম। কোপাই নদী, তাট এঁকেবেঁকে চলা গতিপথ, পাথর দিয়ে বাঁধানো পাড়, দুপাশে ফসলে ভরা খেত, শীতের শান্ত দুপুরের অপার নিস্তব্ধতা, নির্জন তীর, প্রায় ফাঁকা মন্দির চত্বর আর মন্দির চত্বরে বসে গাওয়া স্থানীয় বাউলের একতারা বাজিয়ে "আর কত ভাসব দয়াল" আজও কানে বাজে। কোপাইয়ের পাশে নিস্তব্ধ কঙ্কালীতলা এক অন্য রূপে যেন ধরা দিল, পরে আবার গেছি কঙ্কালীতলা কিন্তু সেই শান্ত নির্জনের শূন্যতার মাঝে পূর্ণ রূপটি আর খুঁজে পাইনি। কোপাই নদীকে নিয়েই রবিঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা "আমাদের ছোট নদী।"

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের ছোট নদী–সংকলিত (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পায় হয়ে যায় গোরু, পায় হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুন পাড়া তারি ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাইবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু নাওয়া হল পরে
আঁচল ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর ভর
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া॥

সেখান থেকে আমরা গেলাম সাঁইথিয়ায় মা নন্দীকেশ্বরী মন্দিরে, যেখানে মায়ের গলার হার পড়েছিল। তখন সন্ধ্যে বেলা, যেহেতু শীতকাল তাই পাঁচটাতেই অন্ধকার। সাঁইথিয়াতে এই মন্দিরে দেবীর নামটি শিবের বাহন নন্দী থেকে নেওয়া যার অর্থ নন্দীর যিনি ঈশ্বরী বা নন্দী দ্বারা পূজিতা। মন্দিরের প্রধান মূর্তিটি কালো পাথরের, যা এখন প্রায় লাল। কারণ ভক্তরা প্রার্থনার জন্য পাথরের গায়ে সিন্দুর দেন। দেবীর একটি রূপালী মুকুট এবং তিনটি সোনালী চোখ। মন্দির প্রাঙ্গণে আরো আছে রাম-সীতা মন্দির, শিব মন্দির, মহা সরস্বতী মন্দির, মহা লক্ষ্মী-গণেশ মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, রাধা গোবিন্দ মন্দির, ভৈরব নন্দীকেশ্বরী মন্দির, হনুমান মন্দির সহ উল্লেখযোগ্য কিছু মন্দির রয়েছে। একটি বিশাল পবিত্র গাছ রয়েছে যেখানে ভক্তেরা তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য লাল এবং হলুদ সুতা বাঁধেন। আমরাও সব জায়গায় সাধ্যমতো পুজো দিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

এখান থেকে ফেরার সময় আমরা রাস্তায় দেখলাম একটি গাড়ি খারাপ রয়েছে, কিন্তু জনশূন্য রাস্তায় কোনো সাহায্য পায়নি বলে কি অসহায় অবস্থা তার। আমাদের ড্রাইভার ছেলেটি তার সাধ্যমতো সাহায্য করে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চললো। এরপর আমরা গেলাম বীরচন্দ্রপুর। বীরচন্দ্রপুর একচক্রা গ্রামে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। সেখানে ছয় কোণ বিশিষ্ট প্রাচীন মন্দির ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সপার্ষদ মূর্তি অবশ্য দর্শনীয়। আমরা এখানে যখন এলাম তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা, মন্দির প্রায় রুদ্ধ, তবু ওখানকার সেবায়েতদের সহৃদয়তায় দর্শন হল। তারাপীঠ থেকে বীরচন্দ্রপুর আট কিমি দূরে অবস্থিত। এই সব পীঠস্থান দর্শন করে আমরা তারাপীঠে ফিরলাম রাত আটটায়। সবকটি জায়গাতেই সুন্দর দর্শন হল। পরেরদিন দর্শন করলাম তারাপীঠের মধ্যেই মুণ্ডমালীতলা আর ভারত সেবাশ্রম সংঘের মন্দির।

দেবী তারার অপর নাম কৌশিকী। শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে দেবতারা দেবভূমি হিমালয়ে পার্বতীর জন্য তপস্যা শুরু করেন। শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করতে দেবীর নিজ দেহকোষ থেকে এক দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহামায়া দেবী মানস সরোবরের জলে স্নান করে কালো রং ত্যাগ করে কৃষ্ণবর্ণা দেবী কৌশিকীর

রূপ ধারণ করেন। সেই রূপেই দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ নামের দুই অসুরকে বধ করে দেবতাদের রক্ষা করেন এই তিথিতেই। ১২৭৪ বঙ্গাব্দে কৌশিকী অমাবস্যার তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্বেতশিমূল বৃক্ষের তলায় সাধক বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই এই বিশেষ তিথিতে মায়ের পুজো দিয়ে পুণ্য অর্জনের জন্য কয়েক লক্ষাধিক ভক্তবৃন্দের সমাগম ঘটে তারাপীঠে। এই অমাবস্যার আরেক নাম 'তারা রাত্রি।' তন্ত্র সাধনার জন্য এই অমাবস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তবে শুধু হিন্দু শাস্ত্রে নয়, বৌদ্ধ শাস্ত্রেও এই অমাবস্যার গুরুত্ব রয়েছে। সেই থেকেই পাপের বিনাশ করার জন্যে তারাপীঠ সহ নানান পীঠস্থানে কৌশিকী রূপে পুজো করা হয় মাকে।

ট্রেনে ফেরার সময় রাঙামাটির আঁকাবাঁকা পথের শেষে বিস্তীর্ণ মাঠের পরে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় দূরে দূরে গ্রামগুলি দেখে পটে আঁকা ছবি মনে হচ্ছিল, উপলব্ধি করলাম কেন রবিঠাকুর লিখেছিলেন, গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে।" পল্লীবাংলার এক খন্ড চিরন্তন শান্তির রূপ যেন ধরা পড়েছে ওই সুদূরের প্রদীপজ্বালা গ্রামীণ গৃহকোণ ও গৃহাঙ্গনে আর তাতে বাউল মন যে জাগতিক ঐশ্বর্য ছেড়ে অতীন্দ্রিয়ের দিকে ছুটে যায়।

সেই বছরই ফিরে এসে অঘ্রান মাসের সংক্রান্তীতে আমার ঠাকুরের আসনে মায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর থেকে প্রতিটি কৌশিকী অমাবস্যাতে মায়ের পুজো করেছি। দীক্ষা নেবার পরে ঠিক করি যে আর ওই পুজো করব না। ঠিক কৌশিকী অমাবস্যার আগে স্বপ্ন দেখি আমার গুরু যেন আমায় পুজো করার নির্দেশ দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে এ রকম দেখেছি, কি করা উচিৎ। উনি বললেন, "তোমায় তারা মা বড়ো ভালোবাসেন তো, বুঝলে, তুমি পুজোটা করে যাও।" সেই পুজো আজও আমি করে চলেছি।

BANGLADARSHAN.COM

তারপরে আরো বেশ কয়েকবার গেছি তারাপীঠ। একবার জুন মাসের প্রচন্ড গরমে কলকাতা থেকে ট্রেনে ওঠার সময় মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যেন তারাপীঠে গিয়ে গরমে কষ্ট না হয় যেহেতু ঐদিকে গরম আরো বেশী, ৪২° গরমে ওখানে পৌঁছনোর পরে মেঘ আর বৃষ্টির মেলবন্ধনে হঠাৎই তাপমাত্র ২৫° হয়ে মনোরম আবহাওয়া হয়ে রইলো যে কদিন রইলাম। অনুভব করলাম মা তারা কতখানি ভক্তবৎসলা। শেষবার গেছি বোনের পরিবারকে নিয়ে কারণ ওরা তিনবার টিকিট কেটেও যেতে পারেনি, আমার সঙ্গে যেবার গেল, তার দুদিন আগে থেকে আমার ধুম জ্বর, বোন ভয় পেয়ে এসে বলল যে আমি যেতে পারব কিনা, ওকে আশ্বস্ত করে ঠিক সময়ে ঠিক দিনে সবাই মিলে ট্রেনে উঠে বসে মায়ের কাছে গেলাম, মায়ের দর্শনও হল। তাই বলছিলাম তারামা না টানলে কখনোই তারাপীঠে যাওয়া হয়ে ওঠে না, তীর্থের দেবতা না টানলে তাই তীর্থদর্শন হয়না।

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে করো অধোগামী॥—সাধক কমলাকান্ত

মা তারা ও মায়ের

BANGLADARSHAN.COM

মুন্ডমালিতলা

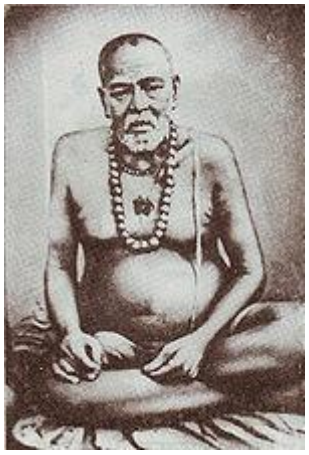

বাবা বামাক্ষ্যাপা

BANGLA AN.COM

বশিষ্ঠ আরাধিতা তারা

বক্রেশ্বর ও মা মহিষমর্দিনী

মা নলাটেশ্বরী মন্দির ও মায়ের শিলা মূর্তি

নন্দিকেশ্বরী মন্দির

বীরচন্দ্রপুর

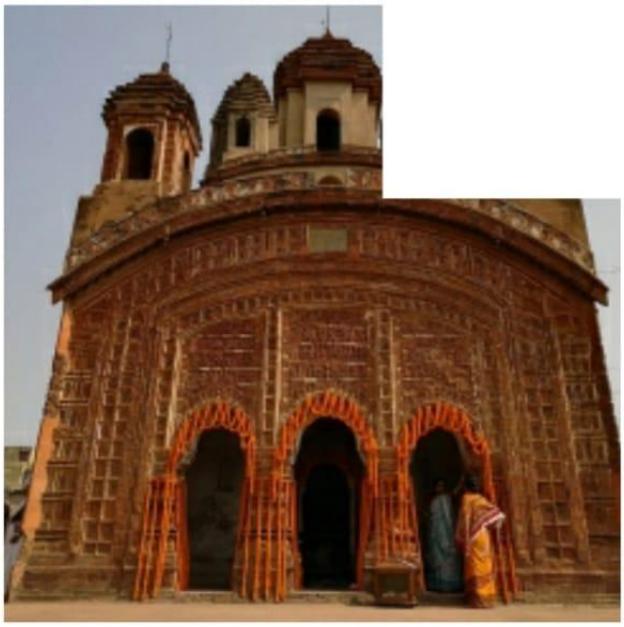

তারাপীঠ রোড
স্টেশনে সূর্যাস্ত

॥ঈশ্বরের নিজদেশে॥

ঘুমোন গেল না, কোচি এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িটা চলতে আরম্ভ করার সময় ভেবেছিলাম গাড়িতে একটু ঘুমোবো, কিন্তু চারপাশের অপরূপ দৃশ্যাবলী দেখতে গিয়ে ঘুমকে ফেরত পাঠালাম তার দেশে। যখন নামলাম কোচিতে প্রচন্ড গরমের কারণে গাড়িতে এ সি চলছে, কিন্তু ঘণ্টা খানের পরে যখন গাড়ি পাহাড়ে উঠতে লাগল, আস্তে আস্তে জানলা খুলে দিলাম, তারপরে তো জ্যাকেট বার করতে হল, এতটাই তাটমাত্রার তারতম্য। ঘুরে ঘুরে গাড়ি উঠতে আরম্ভ করল পাহাড়ী রাস্তায়, প্রকৃতি তার নিজের সাজে সেজে রয়েছে অচেনা অথচ নানান রঙিন ফুলের সাজে, আকাশ কখনো জলভরা মেঘে ঢাকা, কখনো বৃষ্টির রেশ রয়েছে, আবার কখনো রৌদ্রতপ্ত, পাহাড়ের গায়ে গায়ে পেরিয়ে চলেছি অচেনা জনপদ, গির্জা, মন্দির, খাবারের দোকান, বেকারি, বাসস্ট্যান্ড, বাসস্ট্যান্ডে শিশুকোলে অল্পবয়সী জননী, শিশুর তরুণ পিতা অপেক্ষমাণ বাসের আশায়, অনেক নিচে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলছে নাম না জানা নদী। এইসব দেখতে দেখতে পৌঁছলাম মুন্নারের কাছেই “চিন্নাকনাল” জলপ্রপাতটির সামনে যা কিনা পাওয়ার হাউজ জলপ্রপাত হিসেবে পরিচিত, সমুদ্র তল থেকে ২০০০ মিটার উচ্চতায় একটি খাঁড়া পাথর থেকে এই জলপ্রপাতটি ঝরে পরছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজিতে সমৃদ্ধ এই স্থান। আমাদের যাত্রাপথেই পড়ল চিন্নাকনাল থেকে সাত কিলোমিটার ও মুন্নার থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত “আনয়িরঙ্গল” সবুজ চা বাগিচায় ঢাকা। এর জলাধারে একদফা ভ্রমণ এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আনয়িরঙ্গল ঘিরে রয়েছে সবুজ চা বাগিচা এবং চিরহরিৎ অরণ্য। এখানে আমরা বুনো মহিষ দেখলাম। ওই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা খেলাম ডাব আর স্থানীয় মিষ্টি আনারস, অসাধারণ তার স্বাদ আর গন্ধ, এত ভালো লাগল যে আবার কিছুটা সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

BANGLADARSHAN.COM

“অথৈ সবুজ স্বপ্ন জাগে বনের কিনারায়
ফাগুন হেথায় মুখর সদাই প্রাণের ইশারায়
নদীর বুকে ঢেউয়ের কলোল মাতন তুলেছে
ভালোবাসার লগন সবার হৃদয় মোহনায়।”

মুন্নারের জ্বালাপেট্টির টাটার বৃটিশ আমলের গেস্ট হাউসের বাংলোয় সকালের রৌদ্রস্নাত অনাবিল সৌন্দর্যরাজির মাঝে দাঁড়িয়ে এমনই একটা অনুভূতি হল আমাদের। আগের দিন বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় আমরা এসে পৌঁছেছি এই গেস্ট হাউসের বাংলোতে কোচি এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচ ঘণ্টা গাড়িতে বসে। গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের নিয়ে এসেছে তার সুইফট ডিসায়ার গাড়িতে স্থানীয় ছেলে মুনিয়ান্ডি। আসার পথে পড়েছে আদি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালাডি যেখানে সংস্কৃত পঠন, পাঠন ও চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈত বেদান্ত নামের শাখাটিকে শঙ্করাচার্য সুসংহত রূপ দেন। তার শিক্ষার মূল কথা ছিল আত্মা ও ব্রহ্মের সম্মিলন। তার মতে ব্রহ্ম হল নির্গুণ।

প্রথমে ঠিক ছিল আমরা অগাস্ট মাসে মুন্নার যাব, কিন্তু সেই সময় প্রচুর বৃষ্টির জন্য কোচি এয়ারপোর্ট ডুবে গেল, আমাদের যাওয়াটা পেছোতে হল। তারপরে দুহাজার ঊনিশের দশই অক্টোবর যাওয়া ঠিক হল আর আমরা দুর্গাপুজোর দ্বাদশীর দিন এসে পৌঁছলাম কেরালার মুন্নারে। মুন্নার যেন এক অপরূপ সুখস্বপ্ন যেটা আমরা জেগে জেগে দেখলাম ওই কদিন।

পাহাড়ের কোলে আমরা যে গেস্ট হাউসের বাংলোতে ছিলাম তার সামনে ধাপে ধাপে নেমে গেছে ফুলের বাগান আর পিছনে ফলের বিভিন্ন গাছ। ফলের বাগানের রোজের অতিথি হচ্ছে বহুবর্ণের সমাহারে সুন্দর Himalayan Giant squirrel যেগুলো রোজ পেয়ারা গাছের পেয়ারা খেতে আসত। বাগানের সামনে রাস্তা আর রাস্তার পরেই নেমে গেছে চা বাগান। সামনের বাগানের একটু ভেতরের দিকে একটা গ্রীনহাউস আছে যেটা বাগানের দেখাশোনার জন্য ব্যবহৃত হয়। গেস্ট হাউসে ঢোকার মুখে ঠিক গেটের সামনে আছে কাওক্যাচার, সেটা পেরিয়ে ঢুকলে পোর্টিকো যেখানে এসে গাড়িটা দাঁড়ায়, গাড়ি থেকে যেখানে নামলাম তার সামনে বাংলোর মেন দরজা যেটা দিয়ে ঢুকলেই দেবী বনকালীর মূর্তি বসানো যেখানে স্বমহিমায় বিরাজোত বাংলোর গৃহদেবী। তার ঠিক উল্টোদিকে একটা বিশাল ড্রয়িং রুম, ফায়ার প্লেস, তার সঙ্গে লাগানো স্টাডি আর ইন্ডোর গেমস রুম, সব কটা ঘরই খুব সুন্দর করে সাজানো। এর পাশের ঘরটাই আমাদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট ঘর যেটায় ঢুকলে সামনেই চোখে পড়ে ফায়ার প্লেস, এক পাশে কেবিনেট আর বড়ো টিভি, তার পাশে বিশাল বাথরুম, বাথরুমের দরজার পাশে আছে ড্রেসিং টেবিল, ঘরের মাঝামাঝি কার্পেটের লাগোয়া সোফাসেট, তার পরে শোয়ার খাট আর জামাকাপড়ের আলমারি। খাটের লাগোয়া দুদিকে দুটো বেডসাইড টেবিল। খাটের আরেকদিকে রয়েছে আরেকটা ছোট টেবিল। আমাদের ঘরের উল্টোদিকে বিরাট ডাইনিং হল তার ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, ক্রকারি সেট, মোমবাতির স্ট্যান্ড, ক্রকারি রাখার আলমারি আর ফায়ার প্লেস নিয়ে সাজানো, ডাইনিং রুমের সামনেটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা যেখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয় সামনের বাগান, ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া চা বাগান আর দূরের মেঘে ঢাকা সবুজ পাহাড়। সমস্ত বাংলোটা ব্রিটিশ ঘরানার বানানো ১৯৩১ সালে আর পিওর ইউরোপিয়ান সজ্জায় সজ্জিত। বাংলোর কেয়ারটেকার শক্তি, রাঁধুনি মনুবেনের আন্তরিক আতিথেয়তায় আমরা এখানে কাটালাম সাতদিন। কেরালা চিকেন কারি, দোসা, সাম্বার, চাটনি, বাগানের লেবুগাছের লেবু সহযোগে উদরপূর্তি ভালোই হল। এখানে আসলে বোঝা যায় কেন কেরালাকে “ঈশ্বরের নিজভূমি” বলে। নীল নির্মল উন্মুক্ত আকাশ, সবুজের সমারোহে সজ্জিত বনানী, অপার নৈঃশব্দে মোড়া নির্জন প্রকৃতি আর নানান নাম-না-জানা ফুল, প্রজাপতি আর রকমারি পাখিদের আবাসস্থল এই জায়গায় দাঁড়ালে নিজের অস্তিত্ব যেন বার বার মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির ঔদার্য ও অকৃপণ হস্ত কিভাবে আমাদের তার কাছে কৃতজ্ঞ করে, কত নির্ভরশীল তার ওপর আমরা, কতোটা সম্পৃক্ত আমরা ভূমার সঙ্গে, প্রকৃতি যেন আমাদের আত্মায় সমাকীর্ণ। বাংলোটা মুন্নার সিটি থেকে একঘণ্টার গাড়িতে, চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মুন্নার সিটি। পৌঁছনোর পরেরদিন আমরা বাংলোতেই ছিলাম আর আশে পাশের চা বাগান, পাহাড়, পাহাড়ী উপত্যকা পায়ে হেঁটে ঘুরলাম আর অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে উপভোগ করে কাটালাম। পাহাড়ের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে

BANGLADARSHAN.COM

উপলব্ধি করলাম, “বহে নিরন্তর আনন্দে ধারা, বাজে অসীম নভো মাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা।” ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত ওই বাংলোর বাগানে দল বেঁধে অবিশ্রান্ত ডাকে একরকমের ঝিঁঝি পোকা যাদের আওয়াজ বাগানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় কিন্তু সাড়ে ছটার পরে সারা চরাচর ঢেকে দেয় অপার নৈঃশব্দ। শুধু দূর থেকে ভেসে আসে রাতচরা কিছু পাখির ডাক।

মুন্নার দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরালার ইদুক্কি জেলার একটি পাহাড়ী শহর। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাঝামাঝি সমুদ্রতল থেকে ১৬০০ মিটার উচ্চতায় মথিরাপুরা, নল্লাথান্নি ও কুন্ডালা এই তিনটি পার্বত্য নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মুন্নার। এই শৈল শহরটি একসময় দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ সরকারের গ্রীষ্মকালীন রিসর্ট ছিল। মুন্নার শহর দেবীকুলাম তালুকের কানন দেবান পাহাড়ের গ্রামে অবস্থিত, মুন্নারকে “দক্ষিণ ভারতের কাশ্মীর” বলা হয়। বিস্তৃত অঞ্চলে ইতঃস্তত ছড়ান চা বাগিচা, পাক দিয়ে ওঠা রাস্তা এবং অবসর কালীন সুযোগ সুবিধা এই শহরটিকে জনপ্রিয় রিসর্ট টাউন করেছে। এর অরণ্যের উদ্ভিদকূলে এবং তৃণ ভূমিতে জন্মান গাছগুলির মধ্যে অদ্ভুত হচ্ছে নীলাকুরিঞ্জি। এর ফুল প্রতি বারো বছরে একবার পার্বত্য ভূমিকে নীল রঙে মুড়ে দেয়। পরবর্তী ফুল ফোটার সময় ২০৩০ সাল। মুন্নার দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আনামুদি অবস্থিত যার উচ্চতা ২৬৯৫ মিটার। ট্রেক করার পক্ষে আনামুদি একটি আদর্শ স্থান।

মুন্নারের কিছু দর্শনীয় আকর্ষক স্থান আছে যেগুলো পর্যটকদের অনাবিল আনন্দে দেয়, তৃতীয় দিন থেকে আমাদের সেগুলি দেখা শুরু হল।

BANGLADARSHAN.COM

মুন্নার থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে সমুদ্র তল থেকে ১৮৮০ মিটার উচ্চতায় ‘টপ স্টেশন’ অবস্থিত। এটি মুন্নার কোদাইকানাল রোডের সর্বোচ্চ বিন্দু। প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুর বিস্তৃত সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য মুন্নারে আসা পর্যটকরা একবার অন্তত এখানে আসেন। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ফুটে থাকা নীলাকুরিঞ্জি ফুল উপভোগ করার জন্য এটি মুন্নারের একটি অন্যতম স্পট। ইদ্দুকি জেলার সবচেয়ে উঁচু এই স্থানটি ১৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুন্নার’এর চা বাইরে পাঠাবার জন্য ইংরেজরা কুন্ডার ভ্যালি রেলওয়েজ তৈরি করেন। ‘টপ স্টেশন’ ছিল তার একটি টারমিনাস। অস্কার প্রাপ্ত ‘লাইফ অফ পাই’ সিনেমাটিতে ‘টপ স্টেশন’এর দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। চারপাশ জুড়ে প্যানোর্যারমিক ভিউ, ছবির মতন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এক পাহাড়, উপত্যকা, কোথাও বা রুপোলী ধারাজলে জলপ্রপাতের শোভা কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। এক অপরিসীম সৌন্দর্য! বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে উপভোগ করলাম, বার বার মনে মনে বলেছি, “খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে, প্রভু নিরজনে, প্রভু নিরজনে।” কুয়াশায় ঢাকা টপ স্টেশনের সৌন্দর্যও কিছু কম নয়।

আমাদের বাংলোর থেকে ৭ কিমি দূরে অবস্থিত ‘কুন্ডালা লেক।’ সমগ্র এশিয়াতে এখানেই প্রথম পাহাড়ের মধ্যখানে আর্চের আকারে ড্যামটি তৈরি করা হয়েছে। জল গভীর, কিন্তু স্থির। শিকারায় নৌকাবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে, পেডাল বোটে ঘুরে বেড়াচ্ছে নব-বিবাহিতা দম্পতি ও উৎসাহি মানুষজন। এখানে আমাদের অভ্যর্থনা

করে নাচ দেখিয়ে গেল একদল দোয়েল। কুন্ডালা লেকের ধার ঘেঁষে পাহাড় ও উপত্যকায় বিখ্যাত নীলাকুরুঞ্জি ফুল বারো বছর পরপর ফোটে।

কাছেই 'ইকো পয়েন্ট', মুদ্রাপুজা, নাল্লাথানি ও কুন্ডালা পর্বতশ্রেণীর মিলনস্থল। একটি বিশাল জলাধারকে ঘিরে পাহাড়'রা দাঁড়িয়ে। লেকের ধারে দাঁড়িয়ে নিজের নাম ধরে একটু জোরে ডাক দিতেই লেকের জল, অরণ্য, পাহাড় আমায় অবাক করে দিয়ে সেই নাম বারবার ডাকতে থাকল প্রতিধ্বনিতে। জলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে এক ঝলক দেখা যায় ইন্ডিয়ান রবিন, ব্লু ফ্লাইক্যাচার ইত্যাদি পাখি। প্রকৃতির অকৃপণ দানে দুটি জায়গায় দৃষ্টিনন্দন। আমরা গোল নৌকোয় লাইফ জ্যাকেট পরে নৌকো বিহার করছিলাম এরমধ্যে বৃষ্টি নামল। তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হল তাই কিনারায়।

মুন্নার শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত "মাত্তুপেট্টি ড্যাম" একটি আকর্ষণীয় স্থান। ১৭০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত মাত্তুপেট্টি পরিচিত তার কংক্রিটের তৈরি বাঁধ এবং হ্রদের জন্য। চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই হ্রদে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে অনায়াসে আরামে নৌকা বিহার করা যায়। মাত্তুপেট্টি তার ডেয়ারি ফার্মের জন্যেও পরিচিত। এই ফার্মটি চালায় ইন্দো-সুইস লাইভস্টক প্রজেক্ট। এখানে বেশি দুগ্ধপানে সমর্থ গাভী দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের মাঝখানে কংক্রিটের এই ড্যামে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এখানে ভোরে কখনও কখনও হাতিরা জল খেতে আসে, দেখা যায় অনেক রকমের পাখি। রিসার্ভয়ারের ভিতরে ৫৫ কোটি কিউবিক মিটার জল ধরে। ড্যামের অন্যপাশে রিসার্ভয়ারে স্পিড বোটের ব্যবস্থা, বাচ্চাদের জন্য নানারকম গেমন কর্নার জায়গাটিকে বেশ সুন্দর পিকনিক স্পট বানিয়ে তুলেছে। ছোট জলাশয়ে ছোট্ট ছোট্ট রঙ্গিন মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেরালা'র বিখ্যাত প্রাকৃতিক পেডিকিউর'এর জন্য এইসব মাছ ব্যবহার করা হয়। প্রচুর ফটো তুলে, কাজুবাদাম, কলার চিপস কিনে আমরা গাড়িতে উঠলাম।

BANGLADARSHAN.COM

এরপর চললাম 'মুন্নার ফ্লোরিকালচার সেন্টারে।' সেখানে নিজেদের জন্য আর ক্যামেরার জন্য টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখি অজস্র ফুলের জলসা, পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে কেয়ারিতে গাছ। গাছের কেয়ারটেকাররা খেয়াল রাখছে কেউ যেন ফুল না ছেঁড়ে, ছোট চারাগাছ বা নতুন কেয়ারি মাড়িয়ে না নষ্ট করে। নানারকমের ডালিয়া, ক্রিসানথিমাম, গোলাপ আর সিজন-ফ্লাওয়ার তো বটেই, ক্যাকটাস ও অর্কিডের ফুল দেখে তো চোখ ফেরানো দায়! ছবি তোলা হলো বেশ কিছু।

পরের স্টপ 'ফটো পয়েন্ট'এ। নীলগিরি পাহাড়ের কোলে মাইলের পর মাইল চা-বাগানের পান্না-সবুজ ব্যাকড্রপ। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দুটি পাতা একটি কুড়ির মিতালীর গল্প। চারপাশে সিলভার ওক গাছের সারি, পাহাড়ি খোলামেলা হাওয়া এই জায়গাটিকে স্বনামধন্য করে তুলেছে। কিন্তু ফটো তোলার সময়ে সাবধান থাকতে হয়। জায়গাটি মাট্টুপেটি যাওয়ার রাস্তায় অবস্থিত বলে গাড়ি ও বাসের চলাচল একটু বেশি। ইউরোপীয়ান শার্প সাহেব আরও কিছু জমিতে চায়ের চাষ শুরু করেন, গোড়াপত্তন হয় 'ফিনলে এস্টেটের।' ১৯২৪এ প্রচন্ড বৃষ্টি-বন্যায় চা-বাগানের প্রচুর ক্ষতি হয়। তবুও স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় কাজ আবার এগোতে

থাকে। ১৯৬৪এ টাটা সংস্থা ফিনলে কোম্পানির সাথে হাত মেলান ও 'টাটা-ফিনলে গ্রুফ অফ কম্পানীস' তৈরি হয়। পর্যটন-বিভাগ বিংশ শতাব্দীতে মুন্নার'কে আবিষ্কার করেন। চা-বাগান, পাহাড়, সবুজ-অরণ্য, ঝর্ণা, নদী সব মিলিয়ে অপরূপ পরিবেশ। ফটো পয়েন্টের থেকে একটু এগিয়ে আমরা বুনোহাতির পাল দেখলাম।

পরেরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে প্রথম গেলাম 'গ্রীনফিল্ড মুন্নার স্পাইসেস অ্যান্ড হার্বাল গার্ডেন'এ আমরা। উদ্যানের গাইডের সাথে বেড়িয়ে বেড়ালাম অনেকক্ষণ, চিনলাম গোলমরিচ ও এলাচের গাছ, দারুচিনির বন, লবঙ্গ, কাজুবাদাম ও কোকো বিন্‌স-এর গাছ। অবাক লাগল, কফি নামক যে পানীয়টি দুনিয়া জয় করে ফেলেছে সেটি দেখলাম ছোট্ট ছোট্ট ফলের থেকেই তৈরী হয়। সেই ফল সময়ে তৈরী হলে তাদের শুকিয়ে, ঝেড়ে ফেলে, রোস্ট করে তারপর গুঁড়ো করে তবেই তৈরী হয় মনোমোহিনী পানীয়। নাটমেগ বা জায়ফলের গাছ, আদা, অম্বা হলুদ দেখতে দেখতে জানতে পারলাম খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল থেকেই ব্যাবিলন ও ইজিপ্টের লোকেরা কেরালায় খুঁজে পেয়েছিল নানারকম সুগন্ধী মশলার গাছগাছড়ার সম্ভার। পরবর্তী কালে আরব, গ্রীক ও রোম্যানরা কেরালার নাম দিয়েছিল "দ গার্ডেন অফ স্পাইস।" ভাস্কো-দা-গামা জলপথ আবিষ্কারের পর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে পরিচিত পায় এই জায়গাটি। জানা গেল যে ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০০০-২০০০০ বনৌষধির গাছ আছে যাদের ব্যবহারে নানারকম রোগের উপশম করা সম্ভব। এদের অনেকাংশই কেরালায় পাওয়া যায়। ঋক বেদ, অথর্ব বেদ ও যজুর্বেদে বর্ণিত অসংখ্য গাছগাছরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই রাজ্যের পাহাড়-অরণ্যে। কথা বলতে বলতেই গাইড মহিলাটি দেখাতে থাকলেন ব্রাহ্মী, অশ্বগন্ধা, দারুহরিদ্রার ঝোপঝাড়। শতাভরী'র স্ত্রীরোগ উপশম করার ক্ষমতা, অগস্ত্যা গাছের ফুসফুস জনিত রোগ ও এলার্জি উপশম করার ক্ষমতার কথা শুনতে শুনতে এককোণে দেখতে পেলাম হাতের তালুর সমান ছোট্ট অদ্ভুত সুন্দর অর্ণামেন্টাল আনারস, ইনসুলিন প্ল্যান্ট, এমনকি বড় গাছকে জড়িয়ে ধরে বেড়ে ওঠা সুন্দর ভ্যানিলা গাছ। জানলাম মোট চব্বিশ রকমের তুলসী আছে, যার মধ্যে আট রকমের তুলসী গাছ রয়েছে এখানে, প্রতিটা প্রজাতি আলাদা আলাদা ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ। দেখলাম জঙ্গলের উৎকৃষ্ট মধু, যার দাম প্রচুর, সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সংলগ্ন দোকানে মশলাপাতি ও ঔষধির বিশাল সম্ভার। দুটি তুলসী তেল, একটি চন্দন তেল, সাম্বার পাউডার, ফিল্টার কফি, জায়ফল আর প্রচুর লোকাল চকলেট আর বড় এক প্যাকেট এলাচ কিনে বেরিয়ে এলাম আমরা। আমাদের পরবর্তী যাত্রা পথে দেখতে পেলাম ভাল্লারা জলপ্রপাত, শীর্ণা ষোড়শীর মত এই জলধারা শুনলাম ভরা বর্ষায় যৌবনবতী হয়ে ওঠে। ছবি তোলা হল কল্লার ব্রীজের যেটা ভাল্লারা জলপ্রপাতের ওপরে রয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

মুন্নারের চিথিরাপুরম থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'পল্লিভাসল' হচ্ছে কেরালার প্রথম জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প। বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর কারণে এই স্থানটি দর্শনার্থীদের কাছে পিকনিক স্পট হিসেবে প্রিয়।

চা আবাদের উৎস ও বিবর্তনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মুন্নারের নিজস্ব উত্তরাধিকার রয়েছে। এই উত্তরাধিকারের কথা মনে রেখে কেরালার উচ্চভূমিতে চা আবাদের সূচনা ও বৃদ্ধির কিছু চমৎকার ও আকর্ষণীয় বিষয় সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য কিছু বছর আগে টাটা টী মুন্নারে একটি মিউজিয়াম তৈরি করেছে। এই "টী

মিউজিয়ামে" হাতে তৈরি চা সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মেশিন এবং ফটোগ্রাফ রয়েছে যার প্রত্যেকটির পিছনে মুন্নারে চা বাগিচার উৎস এবং উন্নতির গল্প লুকিয়ে আছে। মুন্নারের নল্লাথান্নি এস্টেটে টাটা টির এই মিউজিয়ামটি অবস্থিত এবং এটি পরিদর্শন যোগ্য। টী মিউজিয়াম থেকে আমরা গ্রীনটী, এসেন্টিয়াল অয়েল, ধূপকাঠি কিনে আমরা গেলাম মুন্নার সিটিতে সারাভনা ফুড চেনে ধোসা আর লস্যি দিয়ে লাঞ্চ সারতে। এইখান থেকে বেরিয়ে আমরা কিনলাম মুন্নারের বিখ্যাত carrot cake, প্যাশন ফ্রুট আর ওখানকার স্পেশাল সীতাফল, যেগুলোর স্বাদ সত্যি স্বর্গীয়।

পরেরদিন আমরা গেলাম মুন্নারের কাছাকাছি থাকা আর একটি দর্শনীয় স্থান "ইরাভিকুলম ন্যাশনাল পার্ক।" এই পার্ক টি বিখ্যাত বিপন্ন প্রজাতির নীলগিরি থার এর জন্য। ৯৭ কিলোমিটার বিস্তৃত এই পার্কটি দুস্প্রাপ্য প্রজাপতি, জন্তু এবং পাখির আশ্রয়স্থল। ট্রেকিং এর জন্য এই পার্কটি দারুন, এই পার্ক থেকে কুয়াশায় মোড়া চা বাগিচাগুলিকে ছবির মত দেখা যায়। নীলাকুরিঞ্জি ফুলে যখন পর্বতের ঢাল গুলি নীল কারপেটে মুড়ে যায় পর্যটকদের কাছে তখন এর আকর্ষণ বেড়ে যায় বহুগুণ। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই অংশে ছেয়ে থাকা এই গাছে ফুল আসে প্রতি বারো বছরে একবার মাত্র। আনামুদি শৃঙ্গ ইরাভিকুলম ন্যাশনাল পার্কের ভিতরেই অবস্থিত। এটি দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং এর উচ্চতা ২৭০০ মিটার। ইরাভিকুলমে বন এবং বন্যপ্রাণী দপ্তর থেকে অনুমতি সাপেক্ষে এই শৃঙ্গে ওঠা যায়।

BANGLADARSHAN.COM

ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল লাকম ফলস দেখতে, ইদুক্কি জেলার মারায়ুরের কাছে অবস্থিত লাকম ওয়াটার ফলস আসলে ইরাভিকুলম ন্যাশনাল পার্কেরই অংশ, যেটা ইরাভিকুলামের ঝর্ণার একটা অংশ আর পাম্বার নদীর শাখানদী। মুন্নার থেকে ৩০-৩৫ কিমি দূরে উদুমালাইপেটটাই যেতে পড়ে এই জায়গাটা। লাকম ফলস দেখে মুন্নার ফেরার সময় বৃষ্টি শুরু হল। আজ আমাদের মুন্নারে শেষ দিন। এই স্বপ্নরাজ্য ছেড়ে সেই কোলাহল মুখর কল্লোলিনীর কোলে ফিরে যেতে হবে, সে যে আমার স্বজন, মাতৃসমা।

ঈশ্বরের নিজদেশে–দ্বিতীয় পর্ব:

তারপরের দিন আমরা সকালে দশটার সময় বেরিয়ে পড়লাম মুন্নার থেকে ৩৬৫ কিমি দূরে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে। মুন্নার সিটিতে এসে লোকাল চকোলেট, কেক আর কাজু বাদাম কিনে বেরিয়ে পড়লাম কন্যাকুমারীর জন্য। দীর্ঘ নয় ঘণ্টা গাড়িতে যাত্রা বেশ কষ্টকর হয়তো, কিন্তু পথের অপরূপ সৌন্দর্য আর যাত্রাপথের বৈচিত্র্য, কখনো পাহাড়, কখনো জঙ্গল, কখনো সবুজ উপত্যকা, পথের মাঝে মাঝে বিভিন্ন মন্দির, গির্জা, সুসজ্জিত হর্ম্য, কন্যাকুমারীর দুঘণ্টা আগে থেকে উইন্ডমিলের চাকা ঘোরা এইসব দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে গেলাম নিজেরাই বুঝতে পারলাম না। আসার পথে আমাদেরও সারথী একটি রাস্তা ছেড়ে আসার সময় দেখাল ওটি মাদুরাই যাবার রাস্তা। মনে পড়ল ছোট বেলায় পড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কথা, "সে হিসেবে দেখতে গেলে তুমিও একজন দেশ আবিষ্কারক।" নারকেল গাছের সারি, ব্যাকওয়াটার আর

তার ফাঁক দিয়ে মাঝেমধ্যে দৃশ্যমান সমুদ্র দেখতে দেখতে ৩৬৫ কিমি, পথ গাড়িতে যেতে কিছুটা কষ্ট হলেও সেই জার্নি ছিল খুবই উপভোগ্য।

ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধ্যা ৬টা বাজতে যায়, আমাদের গাড়ি "হোটেল ট্রাই সি"-র সামনে এসে থামল। মুনিয়াণ্ডির সঙ্গে সফরের এইখানেই পরিসমাপ্তি, এখান থেকে সে আবার ফেরত যাবে মুন্নারে, সামনে তার বিয়ে, তাকে অনেক শুভেচ্ছা জানালাম আমরা, তারও দেখলাম একটু মনখারাপ, এই কদিনে তার সঙ্গে আমাদের এক অদ্ভুত বোঝাপড়া হয়ে গেছিল যে। হোটেলের রিসেপসনে কথা বলে আমাদের জন্য বরাদ্দ ঘরে লিফ্টের সাহায্যে চারতলায় উঠে লিফ্ট থেকে নেমে যাবার জন্য ঢুকেই সোজা চলে গেলাম ব্যালকনিতে, সেখান থেকে তিন সমুদ্রের সঙ্গম ও বিবেকানন্দ রক–১৩৩ ফুট উঁচু বিখ্যাত তামিল সন্ত কবি থিরুভাল্লুভারের মূর্তি যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। অপলক দৃষ্টিতে বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। অপূর্ব রঙের সমাহারে দিগন্ত আর সাগরকে রাঙিয়ে সূর্যদেব তখন অস্তাচলগামী। আকাশে নানা রঙের আবিরের সমাহার, সামনে তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের হোটেলে দেখলাম তিন চারটি পোষা ময়ূর তাদের ছাদের চিলেকোঠাতে বসে আছে, মাঝে মাঝে ডাকছে। তাদের দেহের রাজকীয় ভঙ্গিমা আর বিচিত্র বর্ণের সমাহার এতো কাছ থেকে দেখে মুগ্ধ হলাম, যে কদিন আমরা ছিলাম তারা তাদের উপস্থিতি আর দর্শন দানে আমাদের ধন্য করে রেখেছিল। এটা আমার দ্বিতীয়বার কন্যাকুমারী আসা, প্রথম বার এসেছিলাম ১৯৮০ সালে, তখন কন্যাকুমারী ছিল একদম ফাঁকা এক মফঃস্বল জায়গা। এখন পুরোপুরি শহর।

BANGLADARSHAN.COM

একটু পরে রাতের খাবারের জন্য বেরিয়ে খাবার খেয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সমুদ্রের ধারে, সমুদ্রের নোনা হাওয়ার সাথে জলের ছিটেতে সারাদিনের ক্লান্তি যেন ধুয়ে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভারতের দক্ষিণতম শেষ স্থলবিন্দুতে, এই ভাবনা মনকে রোমাঞ্চিত করল। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদের আলোয় তখন উদ্ভাসিত কন্যাকুমারীর সঙ্গম। কি সেই অপূর্ব দৃশ্য!!! "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না" বঙ্কিমচন্দ্রের এই অবিস্মরণীয় উক্তিটি এখানে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক সেখানে থাকার পর ফিরে এলাম।

পরদিন সকাল ৫:৩০টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে চলে এলাম সেই ব্যালকনিতে সূর্যোদয় দেখব বলে। লক্ষ্য করলাম আরো বহু মানুষ সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য সমুদ্র সৈকতে ভীড় করেছেন। কিন্তু সবার আশা ব্যর্থ করে দিয়ে আরো বেশ কিছুক্ষণ পর সূর্যদেব দেখা দিলেন দিগন্তরেখার অনেক ওপর থেকে।

মেঘের ফাঁক দিয়ে তাঁর কিরণ বিবেকানন্দ রকের ওপর পড়তে লাগল, যেন তিনি তাঁর সব তেজ, শৌর্য, দীপ্তি দিয়ে ওই স্থানকে অভয় প্রদান করেছেন। একশো ছাব্বিশ বছর আগে (১৮৯২ সাল) যিনি নাকি ওই উত্তাল সমুদ্রে সাঁতার কেটে পৌঁছে গেছিলেন সেই প্রস্তরখন্ডে এবং ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর, টানা তিন দিন ওই শিলাখন্ডে বসে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন যেখানে মাতা কন্যাকুমারী তপস্যা করেছিলেন, সেই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের নামেই সেই স্থান আজ নামাঙ্কিত–'বিবেকানন্দ রক।'

স্নান সেরে ফেরিঘাটে গেলাম বিবেকানন্দ রকে যাবার লঞ্চ (মঙ্গলবার বাদে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত লঞ্চ চলে) ধরতে। ৫০ টাকা দিয়ে সাধারণ টিকিট কাটার বিশাল লাইনে টিকিট কেটে লঞ্চটায় চেপে বসলাম লাইফ জ্যাকেট পরে এবং ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ৫ মিনিট পরে পৌঁছেও গেলাম। রক টেম্পলের প্রবেশমূল্য ২০ টাকা। জুতো খুলে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে যেখানে উঠলাম সেটা মন্দিরের সামনে দালান বিশেষ। দালানের অপর দিকে আছে শ্রীপদমণ্ডপম মন্দির। এখানে কাঁচের আধারে রক্ষিত আছে দেবী কন্যাকুমারীর পদচিহ্ন। তা দর্শন করে মূল মন্দিরে ঢুকলাম।

ভিতরে বেদীর ওপরে স্বামী বিবেকানন্দের দণ্ডায়মান মূর্তি। দেখে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সেই গান, “বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, একী গো বিস্ময়”, মূল মন্দির থেকে নেমে এসে গেলাম নীচের মেডিটেশন হলে। শব্দহীন আলো আঁধারিতে ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে শুধু ওঁ চিহ্ন থেকে ওঙ্কারধ্বনি বেজে চলেছে। অদ্ভুত সেই অনুভূতিকে যেন ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে প্রশস্ত চাতালে দাঁড়ালাম। সমুদ্রের প্রবল হাওয়া যেন মনের সব দীর্ণতাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সামনেই তিন মহাসমুদ্রের মিলনস্থল, তিনটে জলের তিনটে আলাদা রঙ। আদি শঙ্করাচার্যের পরে বিশ্বের দরবারে হিন্দু ধর্ম ও ভারতভূমির সম্মানের জয়পতাকা যে আজ সসম্মানে উড্ডীন, তার কৃতিত্ব তো এই যোগীশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ মানসপুত্রের।

BANGLADARSHAN.COM

কত শান্ত, কত উদার, অথচ কত গভীর। যুগ যুগ ধরে এভাবেই যেন ধর্ম, পুরাণ, ইতিহাস, প্রকৃতি, দর্শন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ওই তিন মহাসমুদ্রের মত, যার আভাস আমরা পেলেও নাগাল পাইনা, যে নাগাল ওই ‘বীর সন্ন্যাসী’ পেয়েছিলেন। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথাটা নত হয়ে গেল।

জায়গাটা থেকে ফিরতে ইচ্ছা করছিল না, তবুও ফিরতি লঞ্চ ধরে ফিরে এলাম ‘ভারতের মূল ভূখণ্ডে।’ ঠিক হল পরেরদিন আমরা আবার যাব বিবেকানন্দ রকে।

পরেরদিন সকালে প্রথমে যাওয়া হল ৩০০০ বছর পূর্বে ভগবান পরশুরাম কর্তৃক নির্মিত কন্যাকুমারী মাতার (এখানকার স্থানীয় লোকদের ভাষায় আম্মান) মন্দিরের উদ্দেশ্যে, এবার অবশ্য পায়ে হেঁটে। কেউ কেউ বলেন এই মন্দির নাকি ৫১ সতী পীঠের একটি, যেখানে সতীর মেরুদন্ড পড়েছিল, এখানে মায়ের নাম সর্বাণী। কথিত আছে এক কুমারী বালিকা তথা দেবী কন্যাকুমারী সমুদ্রের উপর প্রস্তরখণ্ডে একপায়ে দাঁড়িয়ে ভগবান শিবকে বিবাহ করার জন্য তপস্যা করলে তাতে শিব খুশি হন এবং বিবাহ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সুচিন্দ্রম থেকে কিন্তু দৈব উদ্দেশ্যে জন্ম যে কন্যাকুমারিকার তিনি কুমারী না থাকলে যে অসুরনিধন হবে না, তাই নারদ কাকের ডাক ডেকে শিবের বিবাহযাত্রা রোধ করলেন ফলে মাতা কন্যাকুমারী লগ্নভ্রষ্টা হন এবং রাগে-অভিমানে রান্না করা সমস্ত খাবার ফেলে দেন। আজও দেবী কন্যাকুমারী সেখানে অপেক্ষমান হাতে মালা নিয়ে।

মন্দিরের সামনের প্রস্তরখণ্ডগুলি নাকি সেই খাবারের অংশ বলা হয়। যাই হোক জুতো খুলে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু একি!!! জনপ্রতি ২০ টাকা প্রণামী (টিকিট বলা ভালো) না হলে নাকি মন্দিরে ঢোকা যাবেনা,

কি আর করা যাবে তাই দিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মন্দিরটি যে বেশ পুরোনো তা দেখেই বোঝা যায়, আর মন্দিরের গায়ের ভাস্কর্যের কোন তুলনা নেই। মাতা কন্যাকুমারীকে ভক্তি ভরে পুজো দিয়ে আমরা এসে বসলাম সমুদ্রের পাড়ে। সেখানে ফটো তুলে ত্রিসাগর সঙ্গমের জল ভরলাম। তারপরে স্থানীয় দোকানে ইডলি, দোসা, উত্তাপম আর কফি খেলাম জলখাবারে। দোকানটি স্থানীয় শ্রমিকদের জন্য খাবার বানায়, কিন্তু তাদের খাবারের মান অতুলনীয়।

হোটেলে ফিরে পোশাক পরিবর্তন করে চললাম আরেকবার বিবেকানন্দ রক দর্শনে, আমি অনিচ্ছুক ছিলাম যেতে কারণ মুন্নারের ওই শীতল আবহের পরে কন্যাকুমারীর গরমে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আবার কবে আসা হবে, এজীবনে আদৌ আর আসা হবে কিনা এইসব ভেবে গেলাম। প্রচন্ড রোদ্দুরে আর গরমে কষ্ট হলেও কিছুক্ষণ ওখানে রইলাম, ওখানে জলাধারে ঘুরে বেড়ানো প্রচুর মাছ আর তাদের জন্য অপেক্ষায় বসে থাকা পানকৌড়ি আমাদের দেখা দিয়ে গেল বেশ কয়েকবার। ভাবছিলাম দাঁড়িয়ে "বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ভুলি নাই তব দান।" সেখান থেকে আমরা গেলাম বিখ্যাত তামিল সন্ত কবি থিরুভাল্লুভাবের সমাধি ক্ষেত্র, উথাল পাথাল হাওয়া আর নির্জনতা আর সন্ত কবির দেয়ালে লেখা উপদেশগুলো পড়লাম, চারতলায় উঠে কিছুক্ষণ বসে নেমে এলাম নিচে, সেখানে লঞ্চে উঠে শুনলাম এক বাঙালি মা তার মেয়েকে কবি থিরুভাল্লুভারের মূর্তিটি দেখিয়ে বলছেন যে ওটি শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি। মূল ভূখণ্ডে ফেরত এসে কন্যাকুমারীর সারাভানা ফুড প্লাজাতে স্থানীয় বাটার দোসা, সাম্বার দিয়ে ভোজন করে টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফেরত এলাম। কিন্তু মন পড়ে রইল ওই প্রস্তরখন্ডে। পরেরদিন একুশে অক্টোবর আমাদের ফেরার বিমান ত্রিবান্দ্রাম থেকে বেলা চারটেতে।

BANGLADARSHAN.COM

পরেরদিন ভোরে উঠে আরেকবার চেষ্টা করলাম সূর্যোদয় দেখার কিন্তু বিধি বাম, আকাশ কালো করে মেঘে ঢেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমরা তৈরী হতে হতে রিসেপসন থেকে জানাল গাড়ি এসে গেছে, নিচে নেমে দেখি শ্রীমান রাজা নামে নতুন সারথি অপেক্ষায় রয়েছে, সে এক বর্ণ ইংরেজি বোঝে না, হিন্দিও তথৈবচ। কিন্তু আমাদের হোটেলের ম্যানেজার ভদ্রলোক তাকে আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, সব মালপত্র সহ গাড়ি ছাড়ল বেলা আটটায়। মসৃণ পিচঢালা রাস্তা দিয়ে নারকেলগাছের ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রকে সাথে নিয়ে, আবার কিছু মন্দির, গির্জা, বেকারি, দোকানপাট, ঘর, বাড়ি, নারকেলবাগান পেরিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পড়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল কোভালাম বীচের সামনে। আরব সাগরের নীল জলরাশির সঙ্গে সোনালী বালির আর স্লেট রঙা পাথরের সমুদ্রতট, নারকেলগাছের সারি আর সবুজ ঘাস দিয়ে ঘেরা কোভালাম সারা পৃথিবীর মানুষের অন্যতম স্বপ্নের জায়গা। আমাদের হাতে সময় কম কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে যাই কি করে? শেষে বেশ কিছু দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে চরৈবেতি। এবার গন্তব্য ত্রিবান্দ্রামের পদ্মনাভস্বামী মন্দির। প্রথম যখন ট্যুর প্লান হচ্ছিল তখন ত্রিবান্দ্রাম হয়ে ফেরা হবে শুনেই অরিজিৎবাবুকে বলেছিলাম পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে যাবার কথা, কিন্তু তখন তিনি পাত্তা দেননি, কন্যাকুমারীর হোটেলের ম্যানেজার যখন বললেন একই কথা আর দেখা গেল এক যাত্রাতেই সেটা সম্ভব, তখন তিনি রাজি হলেন। কিন্তু নারায়ণ আরো কিছু ভেবে রেখেছিলেন আমাদের জন্য, সেদিন সকালে

বেরোনোর জন্য আমরা সকাল থেকে অভুক্ত ছিলাম, মন্দিরে পৌঁছলাম বেলা এগারোটা নাগাদ। মন্দিরে ঢুকতে গেলে মেয়েদের শাড়ি পরে, আর ছেলেদের ধুতি আর উত্তমাঙ্গ অনাবৃত করে ঢোকার নিয়ম। সেই মত আমার আর মেয়ের শাড়ি আর অরিজিৎবাবুর ধুতি কিনে পরে মন্দিরে ঢুকলাম। বেশ বড়ো লাইন পড়েছে, আমরা তুলসী মালা, পদ্ম ফুল, ওখানকার পুজোর জিনিস কিনে লাইনে দাঁড়িয়েছি, মেয়ে মন্দিরে দেয়ালগুলো তার বাবাকে দেখিয়ে বলছে, "দেখো কেমন পেতলে মোড়া দেয়ালগুলো", পাশে দাঁড়ানো একজন স্থানীয় ভদ্রলোক ওকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, "No, no, it is made of gold. He is now the richest God of India"। শুনে মেয়ের তো বটেই, আমরাও স্তম্ভিত, আশে পাশের লাইনের অন্য সকলে সেটা সমর্থন করলেন। এবার বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শায়িত স্বর্ণ বিগ্রহ দর্শন করে পুজো দিলাম, পুজো দিয়ে প্রসাদের জিনিস নিয়ে বেরোনোর সময় দেখি নারায়ণের দুপুরের ভোগ প্রসাদ পাবার লাইন পড়েছে, আমরা জিজ্ঞাসা করে সেখানে দাঁড়ালাম এবং ভোগ গ্রহণ করলাম। সুশৃঙ্খল ভাবে লাইন দিয়ে থালা, গেলাস দিয়ে আরেক জায়গা থেকে ভাত, সাম্বার, সবজি নিয়ে চেয়ার টেবিলে বসে খেয়ে সেই বাসনগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে দিলে তারা পরখ করে দেখে নিলেন ঠিকভাবে ধোয়া হল কিনা। ওখান থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকে গেলাম দুটোর মধ্যে, তারপরে বৃষ্টি শুরু হল সাড়ে তিনটে থেকে, ফলে চারটের ফ্লাইট ছাড়ল পাঁচটায়। সারারাস্তা আবহাওয়া খারাপ থাকায় প্লেন খুব ঝাঁকুনি দিতে দিতে এলো, এখানে পৌঁছলাম রাত্রি নটায়। নভেম্বর মাস থেকে কোচি এয়ারপোর্ট সারাবার জন্য সকালের সব ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেল আগামী তিন মাসের জন্য। ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের স্বপ্ন সার্থক করে এক অনির্বচনীয় সফরে ঈশ্বর তার নিজদেশে ঘুরিয়ে দিলেন আমাদের সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুভাবে।

BANGLADARSHAN.COM

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার,
সেইখানেই যোগ তোমার সাথে আমারো।"

কোচি থেকে মুন্নারের রাস্তায়

ইয়েলাপেটটির গেষ্ট হাউস আর
সামনের রাস্তা, চা বাগান

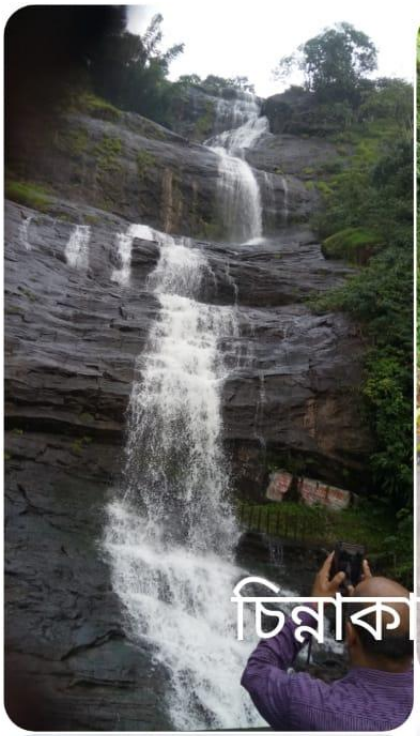

চিন্নাকানাল জলপ্রপাত

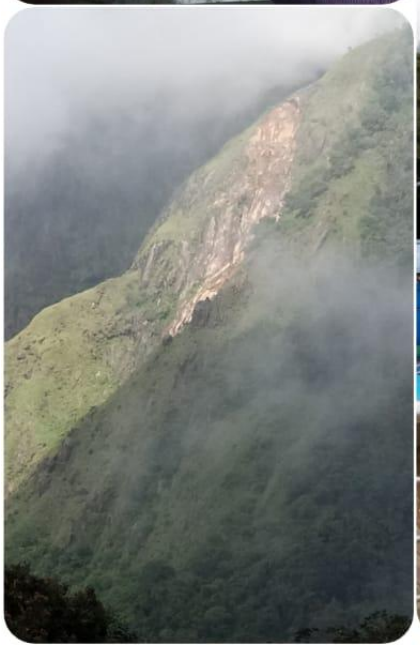

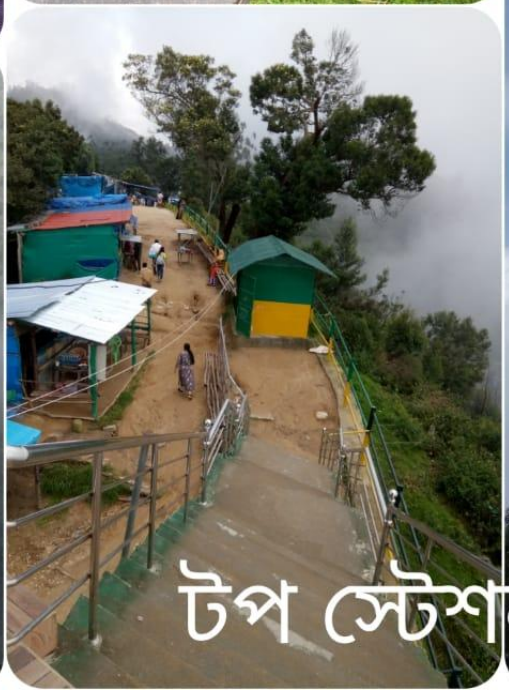
টপ স্টেশন

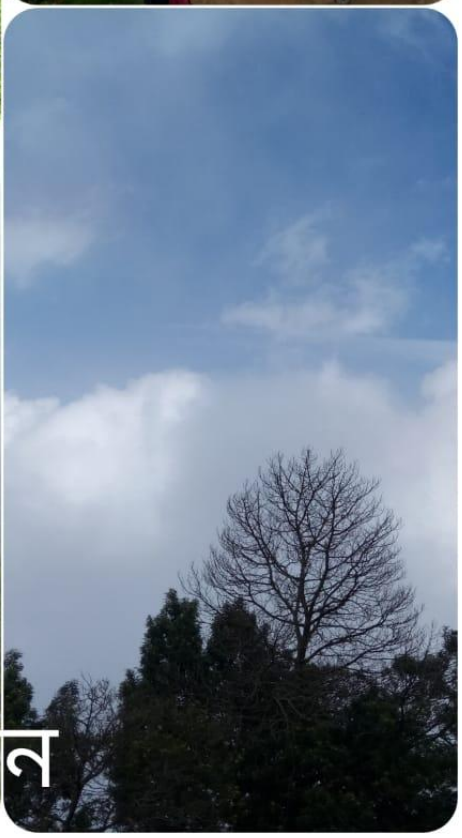

ফ্লোরিকালচার সেন্টার

পল্লীভসল

কুন্ডালা লেক

ইকো পয়েন্ট

মাট্টুপেট্টি ড্যাম

এয়ারপোর্টে,
প্লেনে

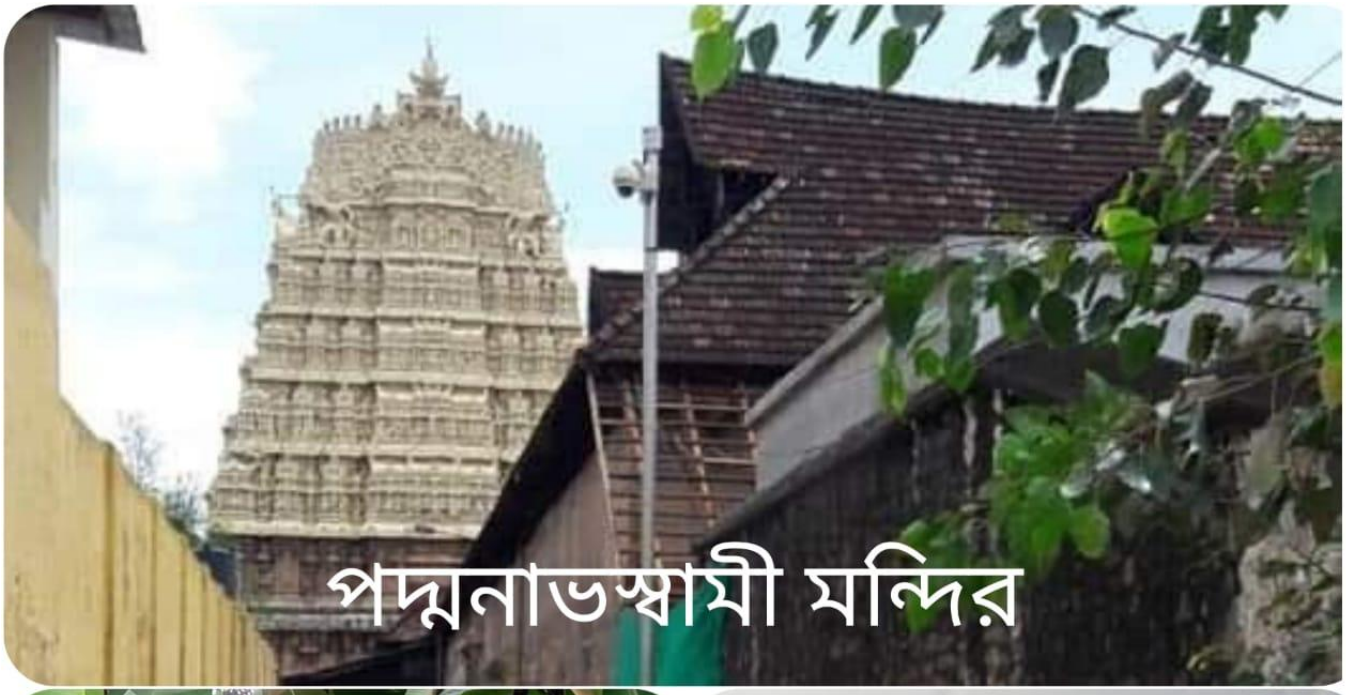
পদ্মনাভস্বামী মন্দির

মন্দির সংলগ্ন বাগান

বৃষ্টি ত্রিভানদ্রাম এয়ারপোর্টে

ছোট এলাচ গাছ
ASHOKAM(ASHOKA TREE)
STAR APPLE
CHUNDA
অন্য ভেষজ গাছ

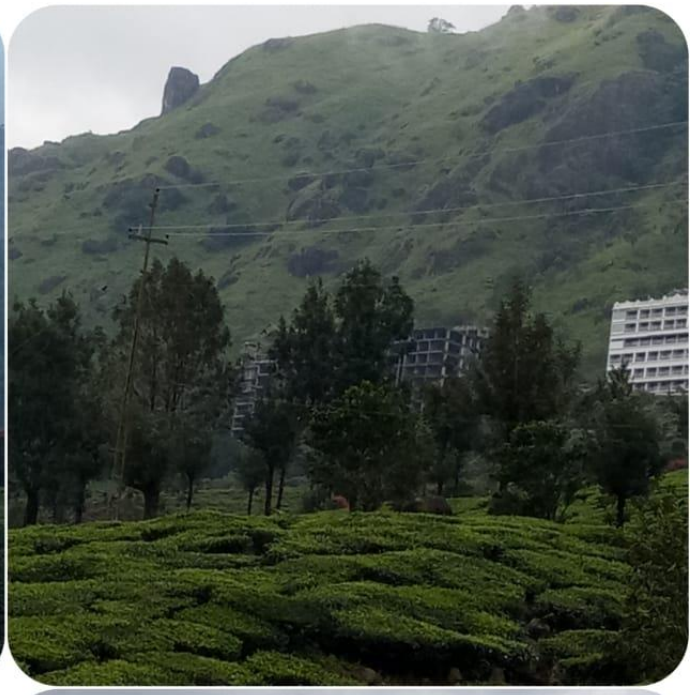

রাস্তার অন্য দিক
থেকে পল্লী ভসল

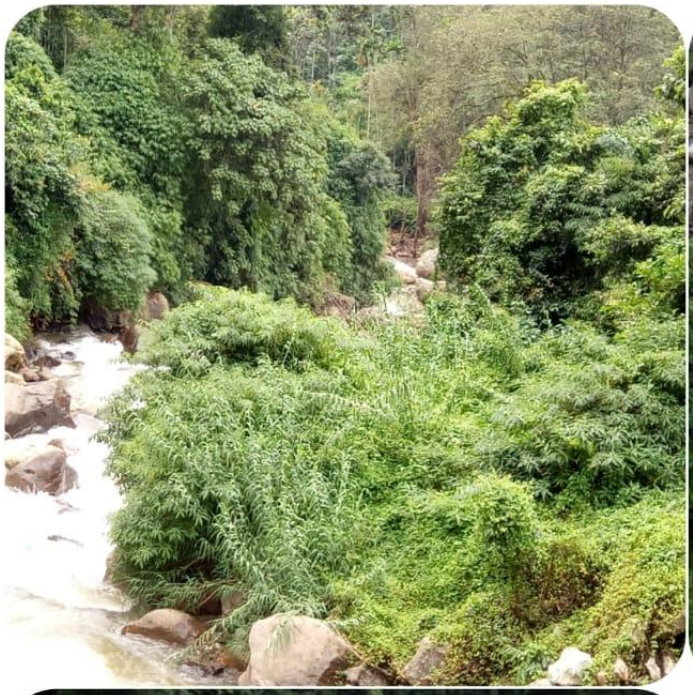

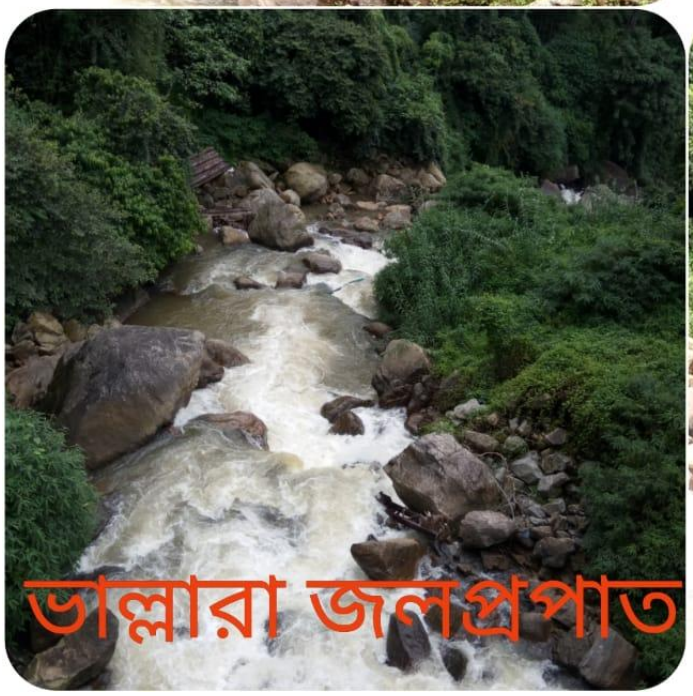
ভাল্লারা জলপ্রপাত

লাকম ফলস

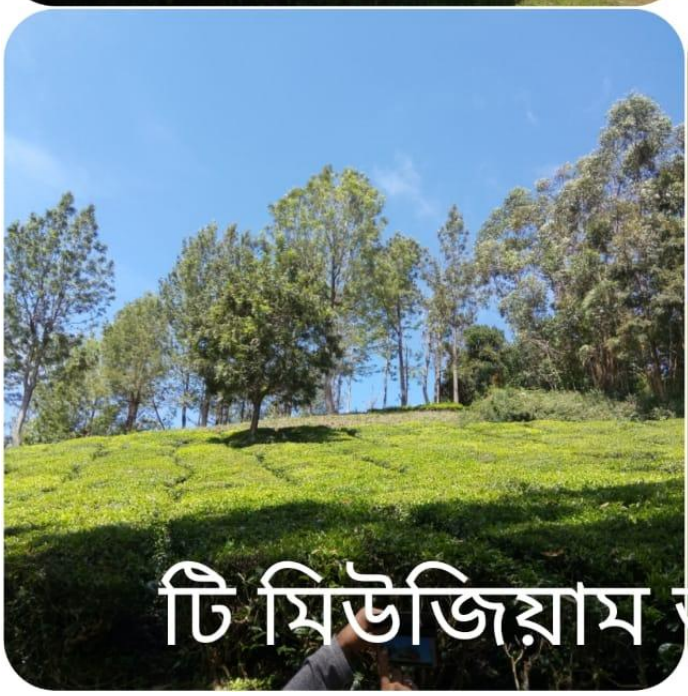

টি মিউজিয়াম আর টি গার্ডেন

আনামুদি শৃঙ্গ

নীলগিরি তাহর

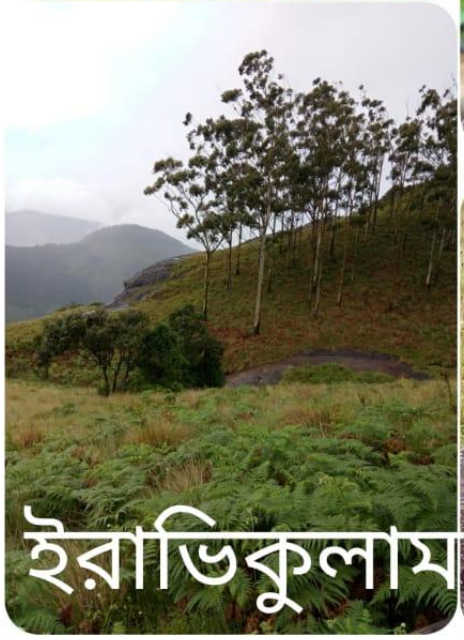

ইরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্ক

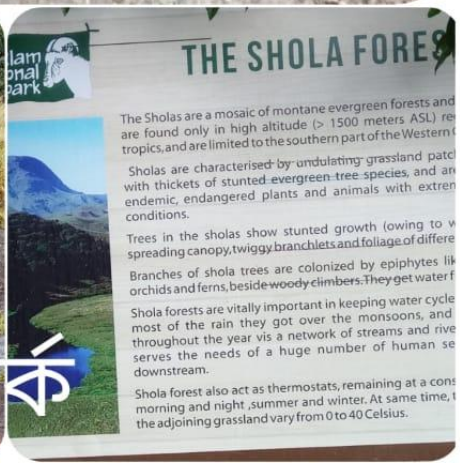

উইন্ডমিল

STOP

ফেরী ঘাটে ফেরী

হোটেলের বারান্দা থেকে সন্ধ্যার
বিবেকানন্দ রক আর
থিরুভাল্লুভারের স্ট্যাচু

মুন্নার থেকে কন্যাকুমারীর রাস্তা

বিবেকানন্দ রকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ঘড়ি

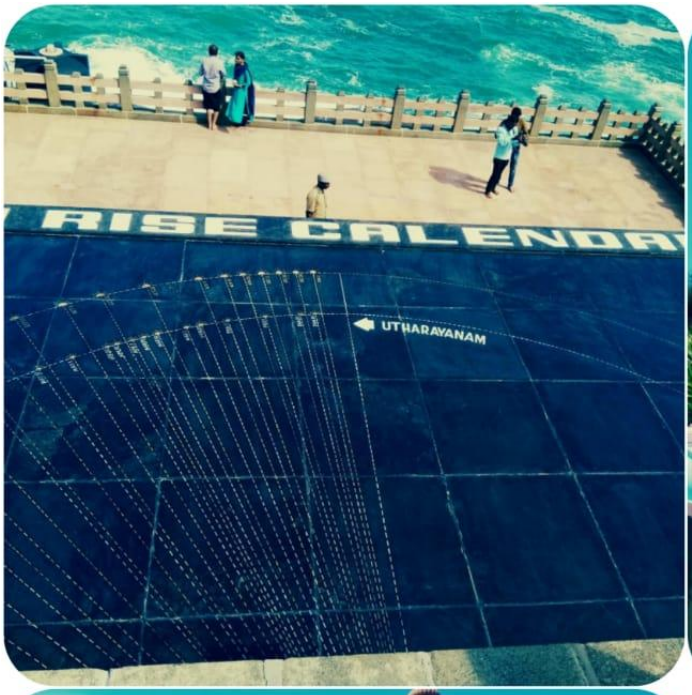
RISE CALENDA
UTHARAYANAM

বিবেকানন্দ রক

কন্যাকুমারীর মন্দির

WELCOME TO THE LAND OF TAHR & NEELAKURINJI
BEING AMIDST THE BLUE HILLS, LET THIS FASCINATION
TRIGGER YOUR PASSION FOR A GREENER WORLD

ഇരവികുളം

॥সমাপ্ত॥